আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা



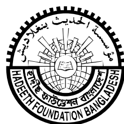
মাহমূদ শীছ খাত্তাব

Contents

আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা

মূল (ইংরেজী) : মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের
আগ্রাসী নীল নকশা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮৩
ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১

أهداف إسرائيل التوسعية فى بلاد العرب
تأليـــف : محمـــود شيـــث خَطّاب
الترجمة البنغالية : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ (ইংরেজী) :
রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা, ১৯৭০ খৃ.
বঙ্গানুবাদ ১ম প্রকাশ : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খৃ.
বঙ্গানুবাদ ২য় প্রকাশ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
শাওয়াল ১৪৩৯ হি./আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/জুন ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী
নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

ARAB BISHWEY ISRAILER AGRASHI NEEL NAKSHA (Israil's Extensional Ambitions in Arab Land), Compiled by : Mahmood Sheeth Khattab in English, Translated into Bengali by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi. Published (2nd Edn) by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

(كلمة المترجم)

১৯৮১-৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোহা হলের এসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটর থাকার সময়ে হলে বসে প্রথমে 'রাবেতা আলমে ইসলামী' মক্কা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৭ পৃষ্ঠার অত্র ছোট সাইজের ইংরেজী বইটি এবং পরে কুয়েত থেকে প্রকাশিত 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' আরবী বইটি অনুবাদ করি (যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে)। অতঃপর অত্র ইংরেজী অনুবাদ বইটি প্রকাশের জন্য 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ঢাকা অফিসে জমা দেই। যা পরে তারা ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও বইটি বাজারে দেখতে না পেয়ে এবং ঢাকার ইফাবা অফিসে যোগাযোগ করে কোন সদুত্তর না পেয়ে ফিলিস্তীনের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বাধ্য হয়ে পরিমার্জনা শেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে পুনরায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃ.) জার্মানীর স্বৈরশাসক হিটলারের পরিকল্পনায় হলোকস্টে প্রায় ৬০ লাখ ইহূদীকে হত্যা করা হয়। ইউরোপ হলোকস্টের এই অপরাধ করলেও শাস্তি চাপানো হয় ফিলিস্তীনী আরবদের উপর। ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর সদ্য গঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অন্যায়ভাবে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডকে ইহূদী ও আরবদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার সাথে সাথে স্বাধীন ইস্রাঈল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। সীমানা নির্ধারিত হয় জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে। যাতে লাখ লাখ ফিলিস্তীনীর উপর নেমে আসে মাতৃভূমি হ'তে বহিষ্কারের মহা বিপর্যয়। হাযার বছর ধরে বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখের অধিক আরব মুসলিম বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র সমূহে স্থায়ীভাবে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। বর্তমানে যা ৫০ লাখের উপরে দাঁড়িয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল লুট করা ও সেখানকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর ছড়ি ঘুরানোর কপট উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তিগুলির যৌথ ষড়যন্ত্রে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে কথিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়। সাধারণ ইহূদীদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি হিব্রু উপাখ্যান (Myth) বা সনাতন ধর্মচেতনাকে কাজে লাগানো হয়। যার পিছনে কোন সত্য নেই। আর তা হ'ল ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীন হ'ল 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি' (Promised land)। অথচ তাদের নবী মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে বলেছিলেন, তখন তারা অস্বীকার করে বলেছিল, 'তুমি ও তোমার প্রভু (আল্লাহ) যাও ও যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্রাঈল রাষ্ট্র জন্মলাভের ঠিক ৭০ বছর পরে ২০১৮ সালের ১৫ই মে তেলআবিব থেকে আমেরিকান দূতাবাস জেরুযালেমে স্থানান্তর করা হ'ল। পুরা জেরুযালেমের উপরে ইহূদীদের দাবী পূর্ণতা লাভের পথে ইস্রাঈল একধাপ এগিয়ে গেল। এভাবে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা দখল করার পর তারা মদীনা ও কা'বা দখলের দিকে এগিয়ে যাবে। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন ইস্রাঈল জেরুযালেমের প্রাচীন নগরী অধিকার করে। তার পরপরই প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে ইস্রাঈলী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বিলাপরত প্রাচীরের (Wailing wall) দিকে মার্চ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, The way to Medina and Mecca is now open to us. 'মদীনা ও মক্কা দখলের পথ এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত'। একই দিনে তারা মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝখানে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নাচ-গানের মাধ্যমে এর পবিত্রতা বিনষ্ট করে (ইন্নালিল্লাহ...)। আজও সেখানে আমেরিকান দূতাবাস উদ্বোধনের দিন একই নির্লজ্জ দৃশ্য দেখা গেল।

লেখক মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব নিজেই ১৯৪৮ সালে ইরাকী সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক হিসাবে ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ফলে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইহূদী পরিকল্পনা, আগ্রাসন

ও ধ্বংসযজ্ঞ, তার দার্শনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্র করণীয় তুলে ধরেছেন।

এই সঙ্গে কারা নির্যাতিত এই পণ্ডিত লেখকের সংগ্রাম মুখর জীবনী সংযুক্ত করা হ'ল।

আশা করি, বাংলাভাষী পাঠক সমাজ এ বই থেকে আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন এবং ফিলিস্তীনী মযলূম ভাই-বোনদের প্রতি তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন।

'হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম বিশ্বকে যোগ্য নেতা দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে মযলূম উম্মাহ্র মুক্তির জন্য উত্তম সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও!' পরিশেষে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

নওদাপাড়া, রাজশাহী

২৫শে জুন ২০১৮ খৃ. সোমবার। **-অনুবাদক**

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখক পরিচিতি

(ترجمة المؤلف)

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (১৯১৯-১৯৯৮ খৃ.) ১৩৩৭ হি. মোতাবেক ১৯১৯ সালে ইরাকের 'মূছেল' নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার বংশধারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র হাসান (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর মাতা মূছেলের অন্যতম আলেম শায়েখ মুছত্বফা বিন খলীল-এর কন্যা ছিলেন। মাহমূদের ভাই যিয়া শীছ খাত্ত্বাব (১৯২০-২০১২ খৃ.) ছিলেন ইরাকের প্রধান বিচারপতি এবং আরেক ভাই আলী ইহসান শীছ খাত্ত্বাব ছিলেন ইরাকী সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল। এছাড়া তাঁর দু'টি বোন ছিল।

মাহমূদ বাল্যকালে দাদীর কাছে লালিত-পালিত হন। যিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ও গরীবদের প্রতি দয়াশীলা ছিলেন। মক্তবে তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। তিনি সেখানে অর্ধেক কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। অতঃপর নিযামিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেন। এ সময় ছুটিতে তিনি মূছেল নগরীর মসজিদ সমূহে বড় বড় বিদ্বানগণের দরসে যোগদান করতেন। যেখানে আরবী ভাষা ও শারঈ ইলম সমূহের উপরে প্রশিক্ষণ নিতেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ১৩৫৬ হি./১৯৩৭ সালে ইরাকী মিলিটারী একাডেমীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে পরের বছর তিনি সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে বের হন। এরপর তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অস্ত্র গুদামের দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে কর্মরত হন। ১৩৬০হি./১৯৪১ সালে ইরাকের চার বারের প্রধানমন্ত্রী রশীদ আলী কীলানীর (১৮৯২-১৯৬৫ খৃ.) নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হন। যাতে তার ভবিষ্যৎ সৈনিক জীবন শেষ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দেন।

অতঃপর তিনি আর্মী স্টাফ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৩৬৭ হি./১৯৪৭ সালে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। ১৩৬৮ হি./১৯৪৮ সালে তিনি ইরাকী বাহিনীর সাথে ইহূদীদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং

অসম বীরত্ব ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত রাখেন। এসময় তিনি এক বছরের বেশী আত্মগোপনে থাকেন। অতঃপর ইরাকী বাহিনীতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ইরাকের অগ্রসর অফিসার্স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৩৭৪ হি./১৯৫৪ সালে সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ সালে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত দলের সাথে তিনি ব্রিটেনে প্রেরিত হন। সেখানে বিভিন্ন দেশের ১০০ জন অফিসারের মধ্যে তিনি প্রথম হন।

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব বিভিন্ন সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় তিনি উন্নত ইসলামী চরিত্রে ভূষিত ছিলেন। যখন ইংরেজ দখলদারিত্বের ফলে ইরাকী সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল।

বন্দী জীবন :

ইরাকে আব্দুল করীম কাসেমের শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৩ খৃ.) তিনি কমিউনিস্ট শাসনের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ও তাদের কোপাণলে পড়েন। ফলে ১৩৭৯ হি./১৯৫৯ সালে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে দেড় বছর যাবৎ বন্দী রেখে তাঁর উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয় ও দেহের হাড্ডি সমূহ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু কারামুক্তির পর আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং তিনি পূর্বের শক্তি ও জোশ ফিরে পান।

মন্ত্রীত্ব :

১৩৮২ হি./১৯৬২ সালে আব্দুস সালাম 'আরিফ (১৯৬২-১৯৬৬ খৃ.) ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লে তিনি তার বন্ধু মাহমূদকে তার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তার পীড়াপীড়িতে তিনি কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.) মিসরের কারাগার থেকে মুক্তি পান। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর আবার বন্দী হয়ে সেখানে ফাঁসি কাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন।

১৩৮৪ হি./১৯৬৪ সালে তিনি মন্ত্রীত্বে ইস্তেফা দেন। কিন্তু ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ সালে তাকে পুনরায় 'যোগাযোগ মন্ত্রী' করা হয়। সে সময় তিনি কায়রোতে

আরব সেনাবাহিনীর জন্য অভিন্ন সামরিক পরিভাষা প্রণয়ন কমিটির প্রধান হিসাবে কাজ করেন। ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ সালে বাগদাদে ফিরে এলে ইরাকী প্রেসিডেন্ট আহমাদ হাসান বকর (১৯৬৮-১৯৭৯) তাঁকে বিভিন্ন উচ্চতর রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রবণতা :

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব সামরিক ব্যক্তিত্ব হ'লেও তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন একজন দূরদর্শী চিন্তানায়ক। এ উদ্দেশ্যে তিনি জ্ঞান-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাকে আরবদের চিন্তার ঐক্যের পথে বাধা মনে করতেন এবং নিয়মবদ্ধ আরবী কবিতাকে আরবী ভাষার অন্যতম স্তম্ভ বলে মনে করতেন। সেই সাথে উদার কাব্য চর্চাকে তিনি আরবী ভাষার বিরুদ্ধে ইহূদী চক্রান্তের ফাঁদ মনে করতেন। তিনি ল্যাটিন হরফে আরবী লেখার আহ্বানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কেননা এর মধ্যে মুসলমানকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত ছিল। তিনি আরবী ভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় সমাসীন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী ছাড়াও তুরস্কসহ বিভিন্ন ইসলামী দেশে ভাষার উপর গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার সমূহে যোগদান করেন।

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব আরব ঐক্যের প্রতি জোর দেন। তিনি মনে করতেন যে, 'ঐক্যই শক্তি। আর এই শক্তি ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী'। ঐক্যের মাধ্যমেই আরবরা সবকিছু করতে পারবে। ঐক্য ছাড়া তারা কিছুই নয়। ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে এটিই তাদের প্রধান অস্ত্র। পক্ষান্তরে অনৈক্য আরবদের ধ্বংস করে ফেলবে। তিনি মনে করতেন যে, মুসলিম উম্মাহ্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান কেবল ইসলামেই রয়েছে।

লেখনী সমূহ :

তিনি একজন উঁচু স্তরের গবেষক ও চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২০-এর ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে ৩০টি সামরিক গবেষণা মূলক। যেমন জায়শুন নবী, ইরাদাতুল ক্বিতাল ফিল জিহাদিল ইসলামী, বায়নাল

Contents

আক্বীদাহ ওয়াল ক্বিয়াদাহ প্রভৃতি। এছাড়া ২৩শে মে ১৯৬৭ হ'তে ৫ই জুন ১৯৬৭ পর্যন্ত ১৪ দিনের আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের সপ্তাহকাল পূর্বে প্রকাশিত 'আল-আইয়ামুল হাসেমাহ' গ্রন্থটি ইহূদীদের বিরুদ্ধে আরবদের করণীয় বিষয়ে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এতদ্ব্যতীত ২০টি বই ছিল মুসলিম বিজেতাদের জীবনী সম্পর্কিত। যেমন, আর-রাসূল আল-ক্বায়েদ (সেনাপতি রাসূল), খালেদ বিন ওয়ালীদ আল-মাখযূমী, সুফারাউন নবী (রাসূলের দূতগণ), ক্বা-দাতু ফাৎহিল ঈরান ওয়াল জাযীরাহ প্রভৃতি।

তিনি মিসর ও ইরাকের আরবী ভাষা একাডেমী পত্রিকা, মাজাল্লা আল-আযহার, মাজাল্লা আল-'আরাবী, আল-ওয়া'ঈ আল-ইসলামী, মাজাল্লাতু মা'হাদিল বুহূছ ওয়াদ দিরাসা-তিল 'আরাবিয়াহ প্রভৃতি উঁচু স্তরের পত্র-পত্রিকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। তিনি রেডিও ও টিভিতে মুসলিম সামরিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্যবহুল আলোচনা করেন।

তিনি ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের আরবী ভাষা একাডেমী সমূহের সদস্য ছিলেন। তিনি রাবেতা ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মক্কার মসজিদ সমূহের উচ্চতর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ওআইসি ফিক্বহ একাডেমীর সদস্য ছিলেন।

মৃত্যু :

আরব অনৈক্য, ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও কুয়েত দখলের মর্মান্তিক ঘটনা সমূহের পর ভগ্ন হৃদয় নিয়ে কোনরূপ অসুখ-বিসুখ ছাড়াই ১৯৯৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর (২৩শে শা'বান ১৪১৯ হি.) সকালে তিনি ৭৯ বছর বয়সে স্বগৃহে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কন্যা তাঁকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। তিনি তার সাথে সাথে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত সমাপ্ত করেন। এরপর তাঁর গলা শুকিয়ে এলে তিনি স্ত্রীর কাছে এক গ্লাস শরবত চান। স্ত্রী শরবত তৈরী করতে রান্না ঘরে গেলে কয়েকবার কালেমা শাহাদাত পড়ার পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এসময় তিনি জাতির কল্যাণে এবং ইসলাম ও দেশের মহব্বতে ১২০টির অধিক বই ও লেখনী সমূহ ছেড়ে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন- আমীন!

লেখক কর্তৃক ৩য় সংস্করণের মুখবন্ধ
(Preface)

বইখানি মাত্র এক মাসের কম সময়ের মধ্যে কায়রোতে দু'বার মুদ্রিত হয়। ১ম বার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমলে দেশের ইসলামী বিষয়ক সুপ্রিম কাউন্সিল কর্তৃক ৫,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বার কায়রোর ইসলামী গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক ১১,০০০ কপি প্রকাশিত হয়। দু'টি সংস্করণের সমস্ত বই মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মিসরে বিক্রি হয়ে যায়। এই অকল্পনীয় সাফল্যের জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, যার অপার অনুগ্রহ ব্যতীত এটা কোন ক্রমেই হ'ত না।

এই বই মূলতঃ একটি গবেষণা পত্রের গ্রন্থরূপ মাত্র, যা বিগত ১৩৮৯ হিজরীর যিলহাজ্জ মাস মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ১৯৭০-এ কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের পঞ্চম অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং এই গবেষণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের উক্ত পঞ্চম অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। যে অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীগণ যোগদান করেছিলেন।

আমি এ বইয়ে আরব বিশ্বের প্রতি ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী লালসার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছি কেবলমাত্র এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য যে, ইস্রাঈল অন্য আরব ভূখণ্ডে নয় বরং শুধুমাত্র ফিলিস্তীনের উপরেই তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট। তাছাড়া ইহূদী সম্প্রসারণবাদী নীতির পশ্চাতে মতবাদগত, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কেও আমি আলোকপাত করেছি।

উক্ত আলোচনার জন্য আমি ইস্রাঈলের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতা-বিবৃতি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহের অংশ বিশেষ, সরকারী প্রকাশনা ও তাদের রেডিও-টেলিভিশনের প্রচারণা সমূহকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছি। উপসংহারে আমি তাদের বাস্তব কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেছি।

Contents

এ বই পুনঃমুদ্রণের উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে বইটি কেবল আরবদের ঘরে নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।[১]

পরিশেষে আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ্র নিকট যেন তিনি অধিক সংখ্যক লোককে এই বই হ'তে উপকার লাভের তাওফীক দান করেন। আমি মহাশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সকল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং দরূদ পেশ করছি তাঁর শেষনবী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর। ইতি-

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব

কায়রো :

৩রা জুমাদাল ঊলা ১৩৯০ হি./৬ই জুলাই ১৯৭০ খৃ.

১. অনুবাদকের মূল উদ্দেশ্যও তাই, যাতে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলিমের ঘরে ইহূদীদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। -অনুবাদক।

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা
(Introduction)

যারা মনে করেন যে, ইস্রাঈল একটি দুর্দৈব শক্তি, এ কেবল ফিলিস্তীনের উপর আপতিত হয়েছে, এর লালিত আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা ফিলিস্তীনের সীমানা অতিক্রম করে অন্যের দিকে ধাবিত হবে না, তারা ইহূদীদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বরং বাস্তব সত্য এটাই যে, ইস্রাঈলী বিষফোঁড়া আজ আরবদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহাসিক অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর উপর আক্রমণ ও দখল কায়েম করার জন্য ইস্রাঈল বর্তমানে বস্তুগতভাবে একটি সুসজ্জিত ত্রাস।

ইস্রাঈলের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে, যার মধ্যে ইহূদীদের সম্প্রসারণবাদী ও আগ্রাসী লালসা এবং ভবিষ্যৎ চক্রজাল পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে, আমাদেরকে ইস্রাঈলী সম্প্রসারণবাদের মুখোশ উন্মোচনে সাহায্য করবে এবং এর ফলে আরবরাও সজাগ হ'তে পারবে যে, কিভাবে তারা ভবিষ্যৎ ইস্রাঈলী আগ্রাসন থেকে নিজেদের দেশগুলিকে রক্ষা করবে।

ইস্রাঈলের প্রস্তুতি পর্বকে আমরা দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি।-

১. ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের সময়কাল : যখন ইহূদীবাদ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে ব্যাপৃত ছিল।

২. ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীকাল : যখন ইহূদীবাদী আন্দোলন একটি সাংগঠনিক কাঠামো লাভ করে এবং উক্ত সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাস্ল' (Basle) নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইহূদী সম্মেলনে গৃহীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি নিয়মিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে।

ইসরায়েল কোহেন (Israel Cohen) তার 'ইহূদীবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক বইয়ে লেখেন যে, ইহূদীবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল তাদের প্রাচীন স্বদেশ ভূমি ফিলিস্তীনকে পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে ফিরিয়ে আনা।[২]

২. Israel Cohen, A short History of Zionism, -New York 1951.

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহূদীবাদ বাইবেলের (The Bible) সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়নি এবং বিভিন্ন উৎসবাদি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও ফিলিস্তীনে পুনরায় ফিরে যাওয়ার ইহূদী আকাঙ্ক্ষা ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত বিষয়।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাসল' নগরীতে সর্বপ্রথম ইহূদী সম্মেলন শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে 'হার্জেল' (Hertzel) তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন 'আমি যদি ব্যাসল সম্মেলনের ফলাফল এক কথায় বলতে চাই, যদিও তা আমি প্রকাশ্যভাবে বলতে চাই না, তবে তা হ'ল এই যে, ইহূদী রাষ্ট্রের ভিত্তি উক্ত ব্যাস্ল সম্মেলনেই স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এটা যদি এখন আমি বলি, তাহ'লে পৃথিবীর লোকেরা আমাকে ঠাট্টা করবে। এটা পাঁচ বছরেও হ'তে পারে অথবা আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুনিশ্চিত যে, আমার এই কথা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে। লোকদের মনে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অংকিত হয়েছে, তা অবশ্যই আমার উক্ত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে'।[৩] ব্যাস্ল নগরীতে ঐ দিন কি ঘটেছিল? কি কি মৌলিক নীতি ও প্রস্তাবসমূহ সেখানে গৃহীত হয়েছিল?

ইহূদীবাদের এই প্রথম সম্মেলন তাদের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তসমূহকে একীভূত করেছে। যাতে তারা কূটনৈতিক ও কৌশলগত পথ-পরিকল্পনায় এবং মানবিক ও বস্তুগত অস্তিত্ব বাস্তবায়নের উপায় উদ্ভাবনে এক হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ ইহূদী জাতিতে পরিণত হ'তে পারে। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহে তাদের যে মূল উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে। আর সেটি হ'ল ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীনে একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা। যা সর্বসাধারণের গৃহীত আইন অনুযায়ী শাসিত হবে। সম্মেলন মনে করে যে, নিম্নোক্ত উপায়সমূহ তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১. স্পষ্ট মূলনীতির অনুসরণে ইহূদী কৃষি ও শিল্প কর্মীদের দ্বারা সমস্ত ফিলিস্তীনকে একটি কলোনীতে পরিণত করা।

৩. R. Memoirs of Theodore Hertzel : Translated into English by Harry en, N.Y. 1960 (8511-2).

২. প্রত্যেক দেশে প্রচলিত আইন-কানূনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ব ইহূদী সংগঠন ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ইহূদীদের জাতীয় অনুভূতি উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা।

৪. নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সরকারী সম্মতি ও অনুমোদন আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এইভাবে উক্ত সম্মেলন ঘোষণা করেছে যে, ইহূদীরা একটি সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় সত্তা হিসাবে রূপ লাভ করেছে। তাই পরিপূর্ণ অর্থে একটি 'জাতি' হিসাবে তাদের একটি নিজস্ব আবাসভূমি প্রয়োজন এবং সেটি অবশ্যই হ'তে হবে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুত ভূমি ফিলিস্তীন ভূমিতে'।

সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন (Execution of the Resolutions (p. 12) :

'ব্যাস্ল নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইহূদী সম্মেলনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইহূদীরা অনেকগুলি সংস্থা ও নিশ্চিত ফলদায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। যেমন ইহূদী কংগ্রেস, কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, কলোনীগুলোর জন্য ইহূদী ব্যাংক (১৮৯৮), কলোনী সম্বন্ধীয় কমিটি (১৮৯৮) এবং জাতীয় ইহূদী ফাণ্ড (১৯০১)। এই প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কমিটিসমূহ গঠনের পিছনে মূল কারণ ছিল ফিলিস্তীনকে কলোনী বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ড সংগ্রহ করা, উক্ত কার্যক্রমের সংগঠন ও সমন্বয় সাধন করা এবং ব্যাস্ল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নের জন্য ব্যাপক ইহূদী প্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করা।[৪]

সম্ভবতঃ প্রথম দৃষ্টিতেই সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হার্জেল (Hartzel) তাঁর সমস্ত লক্ষ্যের মধ্যে একটি শ্লোগানেরই অবতারণা করেছেন, যেটি তিনি স্বীয় স্মৃতিকথায় নিশ্চিত করে বলেছেন। সেটি হ'ল 'স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কারও কোন পন্থাই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়'।[৫]

ইহূদীবাদ একটি মূলনীতিতেই বিশ্বাসী। সেটি হ'ল The end justifies the means 'লক্ষ্যই উপায় নির্ধারণ করে থাকে'। অতএব নিজেদের পরিকল্পিত

---

৪. বিস্তারিত দেখুন : Abd-el-Wahhab El-Kayall, ÔZionis-expansion aimsÕ Beirut, 1966 P. 7–24.

৫. Hartzal's Memoirs (1616-4).

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেকোন কৌশল অবলম্বন করা থেকে বিরত হওয়া চলবে না। সেটা যত বড় নৈতিকতা বিরোধী কৌশলই হোক না কেন।

নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিসের (ফোরাত) তীরভূমি পর্যন্ত ফিলিস্তীনের সীমানা বলে ইহূদীরা মনে করে থাকে। হার্জেল বলেন, 'এই পরিকল্পিত সীমানা প্রতিষ্ঠার আগে অবশ্যই একটা পট পরিবর্তনের সময়কাল অতিক্রম করতে হবে। যে সময়কালের মধ্যে ফিলিস্তীন অবশ্যই ইহূদী গভর্ণর কর্তৃক শাসিত হবে এবং যখন ইহূদী অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হবে, তখন এই অঞ্চলের উপর ইহূদী আধিপত্য চেপে বসবে'।

ফিলিস্তীনে কলোনী স্থাপন প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয় ১৯০৭-০৮ সালে একটি পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী ইহূদী উদ্বাস্তুদের আগমনের সূত্র ধরে। উক্ত নীলনকশা ফিলিস্তীনের বিভিন্ন অংশে ইহূদী কলোনীসমূহের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বলিত ছিল। একেই পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাদের নিকট প্রদত্ত 'সাইক্স প্রস্তাবসমূহ' প্রত্যাখ্যানের ছুঁতো হিসাবে দাঁড় করানো হয়। ১৯১৫ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'সাইক্স-পিকো' গোপন চুক্তি অনুযায়ী উক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয়। এতে প্রস্তাবিত সীমানা অনুযায়ী আপার গ্যালিলীর (Upper Galilee) কলোনীসমূহ হ'তে এবং প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক এলাকা দ্বারা ইহূদীদেরকে তাদের স্বদেশ ভূমি হ'তে জেরুযালেম ও হাইফা বন্দরের নিকটবর্তী কলোনীসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হ'ত।[৬]

ইহূদী ম্যাগাজিন 'প্যালেস্টাইন' ১৯১৮ সালের ১৯শে অক্টোবর সংখ্যায় সংক্ষেপে ইহূদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সমূহ বর্ণনা করে। যেমন, ইহূদী প্যালেস্টাইন অবশ্যই সমগ্র প্যালেস্টাইন নিয়েই গঠিত হবে। তার মধ্যে কোনরূপ বিভক্তি তারা কখনোই স্বীকার করবে না। ১৯১৫ সালে সম্পাদিত 'সাইক্স-পিকো' (Sykes-Pico treaty) চুক্তি অবশ্য এর উত্তর সীমানাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু অবিভক্ত প্যালেস্টাইন অবশ্যই ট্রান্স জর্দান, গ্যালিলী এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলকে সংযুক্ত করবে।[৭]

---

৬. Friscos Raanan, The Froniers of a Nation, (London 1955), p.78. v.
৭. The Palestine magazine, 4th Vol. No. 11.

(১) জর্ডানে ইহূদীবাদী অভিলাষী লক্ষ্য সমূহ (Zionist acquisitive aims in Jordan (P. 15) :

জর্ডানে ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী মেনাহিম বেগিন (Menahim Begin) প্রতিটি অনুষ্ঠানে ট্রান্স-জর্ডানকে 'শত্রু অধিকৃত এলাকা' হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। বেগিন যে কথা বলেন, সে কথাই তাদের স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের শেখানো হয়।

ইহূদীদের উচ্চাভিলাষ বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় ১৯১৭-২০ সালের মধ্যে। যখন তারা কৃষি, সেচ ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির দাবীতে আন্দোলন কেন্দ্রীভূত করল। যাতে প্যালেস্টাইনের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের উপর ইস্রাঈলের কূটনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করা যায়।

ইহূদীরা ট্রান্স-জর্ডানকে তাদের স্বদেশ ভূমি প্যালেস্টাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে খুব জোর দেয়। তাদের সরকারী প্রকাশনা সমূহেই একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে যখন প্যালেস্টাইনের উপর বৃটেনের সামরিক ম্যাণ্ডেট ঘোষিত হ'ল, তখন ইহূদীদের পরিচালিত প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিন, ইন্টারন্যাশনাল জাইওনিস্ট রিভিউ পত্রিকায় ট্রান্স-জর্ডানকে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা থেকে পৃথক করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।[৮]

১৯১৯ সালের ২৮শে জুন সংখ্যা প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিন ট্রান্সজর্ডানের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, ভবিষ্যতে ইহূদী রাষ্ট্রে প্যালেস্টাইনের জন্য অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রান্সজর্ডানের অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে। ইহূদী প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে ট্রান্স-জর্ডানের উপর। প্যালেস্টাইন ততদিন পর্যন্ত নিরাপদ নয়, যতদিন না ট্রান্সজর্ডান তার একটি অংশে পরিণত হচ্ছে। ট্রান্সজর্ডান হ'ল প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি ।

ইহূদী সংস্থা কর্তৃক শান্তি সম্মেলনে (peace conference) পেশকৃত স্মারকলিপিতে জর্ডান নদীর পূর্ব তীরকে প্যালেস্টাইনের সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে স্পষ্ট দাবী করা হয়। এই সংযুক্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, খ্রিষ্টীয় প্রথম যুগে (Biblical days) জর্ডান নদীর

৮. 'Palestine' issue of 23.11.1919.

পূর্বতীরের উর্বর ভূমি পশ্চিম তীরের সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল। আজকের দিনের স্বল্প জনসংখ্যা বিশিষ্ট ট্রান্সজর্ডান রোমকদের শাসনামলে খুবই ঘনবসতি পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। অতএব বর্তমান কালের নয়া উপনিবেশ বাদীদেরকে (অর্থাৎ ইহূদী বসতি স্থাপনকারীদের) স্বাগত জানানো তাদের জন্য অধিকতর যুক্তিসংগত।

ট্রান্সজর্ডানে কৃষি উন্নয়ন প্যালেস্টাইন ও লোহিত সাগরের মধ্যে মিলনস্থলে পরিণত করবে এবং এর ফলে আক্বাবা উপসাগরে ভাল ভাল বন্দর স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সোলায়মানের (Days of Solomon) আমলে 'আক্বাবা নগরী প্যালেস্টাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় পথের প্রান্তসীমা (Terminus) ছিল। যখন বৃটেন ট্রান্সজর্ডান আমীরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিল, তখন ইহূদী আন্দোলন এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং জর্ডানের এই নতুন অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইহূদী নেতাদের বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয় যে, এর দ্বারা প্যালেস্টাইনকে তার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি থেকে এক আঘাতে বঞ্চিত করা হয়েছে।

ইহূদীরা ট্রান্সজর্ডানে কলোনী স্থাপনে বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আশা ছাড়েনি, বরং উল্টা হেজাযী রেলওয়ে পর্যন্ত একটা বিরাট এলাকা প্যালেস্টাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার জন্য তীব্র চাপ অব্যাহত রাখে। জর্ডানের বর্তমান লোকসংখ্যার ৯৯% শতাংশ এখানেই বসবাস করে। ওয়াইজম্যান (Weizman) ট্রান্সজর্ডান আমীরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মন্তব্য করেন যে, প্যালেস্টাইনে অধিকহারে ইহূদী বসতি স্থাপনই জর্ডানে আধিপত্য বিস্তারের উপায়।[৯]

ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যারা ইহূদী নেতাদের প্রদত্ত ঘোষণাপত্র ও লিখিত স্মৃতিকথাসমূহ পড়েছেন তারা ইস্রাঈলের এ বিশ্বাস অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, জর্ডান নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা দখল করা তাদের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অলংঘনীয় বিষয় (Fait accompli) এবং ইহূদীরা যে কোন সুযোগে জর্ডান দখল করতে কঠিনভাবে সংকল্পবদ্ধ।[১০]

---

৯. 'Palestine' magazine, volume 5, No. 20.

১০. Collected papers: The Arab cultural club, Beirut:, P.I. See also Zionist expansion aims, p. 74-77.

(২) সিরিয়ায় ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য (Zionist aggressive aims in Syria (P. 18) :

১৯১৭ সালের ২৩শে জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' ম্যাগাজিন সিরিয়ার 'হুরান' (Houran) সমতল ভূমি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ শুরু করে এভাবে যে, নতুন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য হুরানের চাইতে অধিকতর প্রভাবশালী এলাকা আর নেই। উক্ত প্রবন্ধে হুরান সমতল ভূমির বিরাট এলাকা নির্দেশ করা হয়েছে। দক্ষিণে যার্কা (Zarka), যা উত্তরদিকে রাজধানী দামেষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিমে গৌর (Gour) অথবা জর্ডান উপত্যকা, পূর্বে তা ক্রমে গোলান (Joulan) মালভূমি এবং উত্তরের লাজা (Laja) আগ্নেয়গিরি সমূহ ও দক্ষিণের বালক্বা এলাকা (Balka land) পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯১৮ সালের জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' ম্যাগাজিন দীর্ঘ দিনের প্রাক্তন ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন (Devid Ben Gurion) এবং ওয়াইজম্যানের পরবর্তী ইস্রাঈলী প্রেসিডেন্ট আইজাক বেন জিভি (Isaac Ben zvi) কর্তৃক লিখিত প্যালেস্টাইনের সীমানা ও এর আয়তন শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এখানে প্যালেস্টাইনের আয়তন হিসাবে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন পাহাড়, পূর্বে সিরিয়ার মরুভূমি এবং দক্ষিণে সিনাই উপদ্বীপ (Peninsula) দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, এটাই হ'ল প্যালেস্টাইনের প্রাকৃতিক সীমানা।[১১]

দুইজন লেখক এভাবে ইহূদী আন্দোলনের দাবীসমূহ বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'অন্যকথায় প্যালেস্টাইন অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সমগ্র নাজাব, জুদিয়া, সামারিয়া, গ্যালিলী, হুরান যেলা, মা'আন ও আক্বাবা সহ কাকঁ যেলা এবং কুনেত্রা, ওয়াদী আনজার ও হাসবিয়া সহ দামেষ্ক যেলার একাংশ।[১২]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষি, পানি প্রবাহ, সামরিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ইহূদীরা দখল করে নিতে চায় হুরান সমতল ভূমি ও হারমন পাহাড়। যা প্যালেস্টাইনে পানি সরবরাহ করে। তারা দখল করতে

---

১১. Palestine magazine Vol. 3. No. 17.

১২. Zionist expansion aims, p. 77-81.

চায় দামেস্ক যেলা, এমনকি দামেস্ক মহানগরী এবং দামেস্ক ও বর্তমান লেবানন-সিরিয়া সীমান্তের মধ্যস্থিত বিস্তৃত অঞ্চল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বস্তি পরিষদের (Peace congress) নিকট পেশকৃত একটি সরকারী স্মারকলিপিতে (Official memorandum) কৃষি, সেচ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে ইহূদীরা সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ দাবী করে বসে। উক্ত স্মারকলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হ'ল।-

'প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করছে সিরিয়ায় অবস্থিত পানির উৎস সমূহের উপর এবং এটা অত্যন্ত যরূরী যে, প্যালেস্টাইন তার প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহের নিশ্চয়তা লাভ করবে। যা দেশকে যথারীতি পানি সিঞ্চন করবে এবং এর সংরক্ষণাগারের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। হারমন পাহাড় (Hermon), যাকে এক সময় 'প্যালেস্টাইনের পানির উৎস' (Father of Palestine's water) বলা হ'ত, দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া ব্যতীত কোনক্রমেই এটাকে প্যালেস্টাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এটা অবশ্যই পুরোপুরিভাবে তাদের অধিকারে থাকতে হবে। যারা এ থেকে অধিকতর সুবিধা ভোগ করবে'।

উপরের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, ইস্রাঈল তার মধ্যে শামিল করে নিতে চায় দামেস্ক মরুভূমির পূর্বের প্রত্যন্ত সীমানা পর্যন্ত এবং দামেস্কের দক্ষিণে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া-জর্ডান সীমান্তের মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল। ১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্মলাভের বহু পূর্বে এগুলো ছিল সিরিয়ার উপরে ইহূদীদের 'বিনয়ী' (Modest) দাবী। এখন তারা ইস্কান্দারুন যেলা পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়াকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

(৩) লেবাননে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য (Zionist aggressive aims in Lebanon (P. 21) :

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি যুগ থেকেই ইহূদীদের লেবানন দখলের স্বপ্ন ছিল। এ ব্যাপারে দক্ষিণ লেবাননকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের পিছনে দু'টি প্রধান কারণ সক্রিয় ছিল।-

(ক) জর্ডান নদীর উৎস এবং লিতানী নদীর মূল স্রোত ও মোহনা এই এলাকায় অবস্থিত।

(খ) ভবিষ্যৎ ইহূদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব।

একথা স্পষ্ট যে, এ দু'টি উদ্দেশ্যই ছিল ইস্রাঈলের সর্বাবস্থায় ও সকল সময়ের একমাত্র চিন্তা-ভাবনা।

১৯১৭ সালের মে সংখ্যা, 'প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিনে'র একটি নিবন্ধে মত প্রকাশ করা হয় যে, লেবাননের বেনিয়াস (Banious) ইহূদী গোত্রীয় অধিকারভুক্ত এলাকার একটি অংশ ছিল। এভাবে ইহূদীদের সকল প্রবন্ধ ও বিবৃতিতে দক্ষিণ লেবানন দখলের ও একে প্যালেস্টাইনের সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। স্বস্তি পরিষদের নিকট পেশকৃত তাদের একটি স্মারকলিপিতে অন্যান্য দাবীর মধ্যে দক্ষিণ লেবাননের উপর তাদের দাবীর কথা জোর দিয়ে বলা হয়।

উক্ত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, প্যালেস্টাইনের সীমানাসমূহ নিম্নোক্ত সীমান্ত রেখা অনুযায়ী হ'তে হবে। যথা, উত্তরে সিডন (Sidon) বন্দরের সন্নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগর থেকে লেবাননের পর্বতমালার নিম্নবর্তী কারওয়ান (Karoan) ব্রীজ। অতঃপর 'আল-বিরাহ' (El-Birah) পর্যন্ত। সেখান থেকে ওয়াদিউল ক্বার্ণ (Wadi-el-qarn) এবং ওয়াদিউত্তীম (Wadi-el-Teem)-এর দুই অববাহিকার মধ্যবর্তী বিভক্তি রেখা বেয়ে দক্ষিণে মোড় নিয়ে হারমন (Hermoun) পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিমের ঢালুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভক্তি রেখা বরাবর এগিয়ে যাবে। ইহূদীরা তাদের এই সরকারী স্মারকলিপিতে জর্ডান ও লিতানী (Litani) নদীর দুই পানির উৎসের উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ লাভের বিষয়ে জোর দিয়েছে'।

ইহূদীদের মুখপত্র 'প্যালেস্টাইন' ম্যাগাজিনে ১৯১৯ সালের ২রা নভেম্বর সংখ্যায় পরামর্শ দেওয়া হয় যে, উত্তর সীমানা সিডনের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্ত ত হবে এবং এই প্রাচীন নগরী সিডনকে প্যালেস্টাইন ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়ার পরে তা বৈরূতের উপকণ্ঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। উক্ত সাময়িকীর ১৯১৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যায় ইহূদী আন্দোলনের নেতারা লেবানন সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন নিম্নোক্তভাবে।-

'মূলতঃ সত্য এটাই যে, প্যালেস্টাইন সীমান্ত এলাকায় সেচ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানির প্রবাহ কব্জা করা একান্ত যরূরী বিষয়। সে কারণে লিতানী নদী ও জর্ডান নদীর উৎসসমূহ এবং হারমন পর্বত মালার তুষার সমূহ অবশ্যই প্রয়োজন'।[১৩]

১৩. The Palestine Magazine, Volume 6, No. 17.

উত্তর সীমান্ত ও এর পানি প্রবাহগুলোর ব্যাপারে একই ধরনের বক্তব্য আমরা দেখতে পাই হার্বার্ট স্যামুয়েলের চিঠিতে প্যারিস শান্তি আলোচনায়। যিনি বৃটিশ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে এর সম্প্রসারণের উপর। যাতে দেশটি সমস্ত ইহূদী অভিবাসীদের জায়গা দিতে সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের উপর। আর এই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পানি ও পানি-বিদ্যুতের অবিরত যোগান। যা পাওয়া যেতে পারে উত্তর সীমান্তের দেশগুলো থেকে। ইহূদী প্রস্তাব অনুযায়ী যা ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবে।[১৪]

সীমান্ত এলাকার উপর বৃটেন ও ফ্রান্সের যৌথ ম্যাণ্ডেট প্রতিষ্ঠিত হ'লে ইহূদীরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করে এজন্য যে, এতে তাদেরকে লিতানী নদী, আপার জর্ডান, হারমন পর্বতমালা এবং হুরান সমতল ভূমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। লেবানন ও লিবিয়ায় ইহূদী বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমানা নির্ধারণে কিছুটা রদবদল করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ফ্রান্সের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এভাবে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে পানির উৎস সমূহ দখল করার ব্যাপারে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে কখনোই হালকা করেনি। ১৯৫১ সালের মে মাসে ইস্রাঈলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'আবা ইবান' (Aba-Eban) ঘোষণা করেন যে, আমরা আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব জর্ডান ও তার পানির উৎসসমূহের ব্যাপারে।[১৫]

আমেরিকার একটি ইহূদী সাময়িকী বলে যে, ইস্রাঈলীদের নিকট এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তাদের নাজাব (Nagab) এলাকা উন্নয়নের স্বপ্ন কখনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না লিতানী নদীর পানি ব্যতীত।[১৬]

অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনে ইস্রাঈলী আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের মধ্যে লেবাননী ভূখণ্ডকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তারা বিবেচনা করে থাকে। এজন্য

---

১৪. The British Government documents, year 1919, Vol. 4, No. 197, article 3, P. 285.

১৫. Zerusalem post paper, Issue of May 2, 1951.

১৬. Middle Eastern Affairs, Issue at the beginning of the year 1955.

তাদের প্রধান লক্ষ্য দক্ষিণ লেবানন, যা লেবাননের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে এবং অন্যতম লক্ষ্য জর্ডান ও লিতানী নদীর উৎসসমূহ দখল করা।[১৭]

লেবাননে ইহূদী আগ্রাসনের শেষ লক্ষ্য হ'ল রাজধানী বৈরূত শহর ও লেবাননের পাহাড় দখল করা। সঙ্গে সঙ্গে পানির উৎসের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে ক্রমে এর উত্তর সীমানাসহ সমগ্র লেবানন কব্জা করা। লেবাননে ক্রমবর্ধমান ইহূদী তৎপরতা আরব দেশসমূহে তাদের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষার কথা তাদের অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে দিয়েছে।[১৮]

(৪) সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে (মিসর) ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য (Zionist aggressive aims in the United Arab Republic (P. 25) :

হার্জেল (Hartzel) বলেন, 'সিনাই এবং আল-আরিশ হ'ল স্বদেশে প্রত্যাগত ইহূদীদের আবাসভূমি'।

১৯০২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে হার্জেল কলোনী বিষয়ক বৃটিশ মন্ত্রী মি. চেম্বারলিনের সাথে দেখা করেন, যিনি ইহূদীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। হার্জেল স্বীয় স্মৃতিকথায় বলেন যে, তিনি বৃটিশ মন্ত্রীর নিকট আল-আরিশ প্রজেক্টের সাথে হাইফা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যোগসূত্রের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিপুল সংখ্যক ইহূদী অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য প্যালেস্টাইনের নিকটবর্তী কোন এলাকা বেছে নেবার কথা ব্যক্ত করেছেন। সাক্ষাৎকারের শেষ দিকে হার্জেল বৃটিশ মন্ত্রীর প্রতি সরাসরি প্রশ্ন রাখেন, 'আপনি কি সিনাই উপদ্বীপে ইহূদী বসতি অনুমোদন করেন'? উত্তরে মন্ত্রী বলেন, 'হ্যাঁ, যদি (মিসরের গভর্ণর) লর্ড ক্রোমার (Kromer) তা অনুমোদন করেন'।[১৯] এই সাক্ষাৎকারের পর হার্জেল তার স্মৃতিকথায় লেখেন যে, বৃটেন ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি স্বায়ত্বশাসিত ইহূদী কলোনী স্থাপনে অনুমোদন দিয়েছে।[২০]

---

১৭. Zionist expansion aggressive aims. P. 71-97.

১৮. বিগত ৬ই জুন'৮২-তে দক্ষিণ লেবাননের উপর ইস্রাঈলের সর্বাত্মক আগ্রাসী হামলা এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। -অনুবাদক।

১৯. Hertzel's memoirs, (1360-1362-2) বিগত ৬ই জুন '৮২-তে দক্ষিণ লেবাননের উপর ইস্রাঈলের সর্বাত্মক আক্রমণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। -অনুবাদক।

২০. Hertzel's memoirs, 1364-3.

উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের পর পরই এবং বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড ল্যান্সডনের পরামর্শ মতে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব হার্জেলকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে আল-আরিশ উপত্যকার ও সিনাই উপদ্বীপে ইহুদী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেন। শুধু তাই নয়, মিসরে হার্জেলের সফর ও তার অনুসন্ধানী দলকে বিশেষ সুবিধাদানের জন্য গভর্ণর লর্ড ক্রোমারকে তিনি চিঠি লেখারও ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

হার্জেলের বিশেষ দূত এর পরপরই বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর চিঠি ও কলোনী বিষয়ক মন্ত্রীর অনুমোদন পত্র নিয়ে মিসর রওয়ানা হয়ে যান। ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বরে হার্জেল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখলেন, 'গ্রীণবার্গ[২১] মিসর থেকে আশাতীত সাফল্য নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি আমাদের স্বার্থের পক্ষে লর্ড ক্রোমার এবং প্রধানমন্ত্রী বুট্রোস গালী পাশা উভয়কেই জয় করে নিয়েছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, সেটা হ'ল, তিনি মি. বয়েল (Mr. Boyle) এবং ক্যাপ্টেন হান্টারসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্ট বৃটিশ অফিসারদের আস্থা অর্জনে সফল হয়েছেন।[২২]

১৯০৩ সালে 'ইহূদী কমিটি' (Zionist Committee) নামে একটি কমিটি হার্জেল নিজে যার অন্যতম সদস্য ছিলেন, মিসর সফরে যায় এবং গভর্ণর লর্ড ক্রোমারের সাথে আলোচনায় বসে। গভর্ণর অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের দাবীসমূহের প্রতি সাড়া দেন এবং উক্ত ইহূদী কমিটিতে নিজের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কমিটি সিনাই ও আরিশ এলাকায় ব্যাপক ইহূদী বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য সেখানে একটি অনুসন্ধানী টীম প্রেরণ করেন।

এটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, যদি উক্ত অনুসন্ধান রিপোর্টে একথা বুঝা যায় যে, ভূখণ্ডটি ব্যাপক ইহূদী বসতির উপযোগী, তাহ'লে ইহূদীদেরকে এই সুবিধা মঞ্জুর করা হবে যে, আগামী ৯৯ বৎসরের জন্য বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে ইহূদীরা উক্ত এলাকায় নিজেদের স্বায়ত্বশাসিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে। হার্জেল এই সময়কার দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নে তাঁর স্মৃতিকথা থেকে কতগুলো উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল।-

২১. Zionist expansion aggressive aims. P. 71-97.

২২. Hertzel's memoirs, (1370-2).

কায়রো ২রা এপ্রিল :

‘গতকালের আলোচনা নিস্ফল ছিল। আমি বলতে পারব না এটা ভাল দিন ছিল, না মন্দ দিন ছিল? আরিশ এলাকায় সুবিধা আদায়ের জন্য আমার পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং অনুমোদিত ছিল। কিন্তু জানি না এটা মিসরীয় সরকারের উপর কি প্রভাব ফেলবে?

আমি বিশ্বাস করি যে, মে ইলোরিথ (May Ellorith)-এর নিকট দেওয়া গ্রীণবার্গের পরিকল্পনার উপর আস্থা স্থাপন করে আমরা একটি ভুল করেছি। কেননা এখানে বিস্তারিত অনেক কিছু শামিল করা হয়েছে। অথচ আমার পরিকল্পনায় মাত্র কয়েকটি আলোচনা রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে একটি অবিরোধীয় পরিকল্পনার সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ। মোটকথা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

কায়রো ৩রা এপ্রিল :

গতকাল সন্ধ্যার পরে আমি মে ইলোরিথ-এর সঙ্গে দেখা করলাম তার টেনিস স্যুট পরা অবস্থায়। কেননা তিনি তখন কেবলমাত্র ‘জেযিরা স্পোর্টস ক্লাব’ থেকে ফিরলেন। এই সাক্ষাতে তাঁকে পরিকল্পনার সফলতায় সন্দিগ্ধ মনে হ’ল। আমার ধারণা হ’ল যে, টারবুশ পরিহিত বৃটিশ ভদ্রলোক মি. ব্রিনিয়ান্ট তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছেন। যাই হোক (সাব্যস্ত হ’ল যে), পরিকল্পনাটি ক্যাবিনেটে আলোচিত হবে।

মূল আপত্তি হবে আমাদের দাবীকৃত এলাকাটির পরিমাণের ব্যাপারে। তারা আমাদেরকে কিছু ভূমি দিতে চান। কিন্তু একটি এলাকা নয়।

১৯০৩ সালের বসন্তকালে ইহূদী কমিশন আরিশ এলাকা থেকে কায়রো ফিরে এলো একটি আশাব্যঞ্জক ফল নিয়ে। হার্জেল পরিপূর্ণ আশা নিয়েই আল-আরিশ ত্যাগ করেন। কেননা তিনি মিসরে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসরত বিত্তশালী ইহূদীদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন।

গভর্ণর লর্ড ক্রোমারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটা সময় নেওয়া হয়েছিল। হার্জেল তার সঙ্গে অত্যন্ত আশাবাদী ও খুশী মনে দেখা করলেন। এমন সময়

হঠাৎ মিসরীয় সরকার ঘোষণা দিলেন যে, পূরা বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরক্ষণেই আর এক ঘোষণায় বলা হ'ল যে, ইহূদীদের জন্য যে এলাকার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল, সেটা একেবারেই শুষ্ক ও অনুর্বর এবং সেখানে নীলনদের পানি দ্বারা নিয়মিত সেচকার্য চালাতে হবে। অথচ নীলনদের প্রতিবিন্দু পানিই মিসরের জন্য অত্যন্ত যরূরী। ইহূদী মিশন ব্যর্থ হ'ল। হার্জেল যেন বজ্রাহত হ'লেন।

এভাবে সেই প্রথম দিন থেকেই সিনাই উপদ্বীপ ও আরিশ উপত্যকাকে কলোনী বানানোর পথে বিভিন্ন প্রকারের বাধা-বিঘ্ন প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেভিড টারটিশ লেখেন যে, 'ব্যাপারটি খুবই সহজ। কেউ তার দেশ প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ শুধুমাত্র পানির অভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না'।[২৩]

এ কথা স্পষ্ট যে, ইহূদীদের দ্বারা সিনাইকে কলোনী বানানোর ব্যর্থতার পিছনে প্রধান কারণ ছিল উক্ত এলাকায় নীলনদের পানি সরবরাহে অসুবিধা। যাই হোক, ইহূদীরা তাই বলে সিনাই দখলের পরিকল্পনা ত্যাগ করেনি, বরং তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মিসরীয় প্যালেস্টাইন (সিনাই) অবশ্যই বৃহত্তর প্যালেস্টাইনে অন্য কথায় ইহূদীদের স্বদেশ ভূমিতে পরিণত হবে।

১৯১৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিনে' প্যালেস্টাইনের সীমানা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে ইহূদীরা প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে সিনাই উপদ্বীপ এবং অন্যান্য সীমানা সম্পর্কে মিসরের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে।

১৯১৮ সালে উক্ত সাময়িকীতে বেন গুরিয়ন ও বেন জিভি লিখিত নিবন্ধে ইহূদীদের স্বদেশ ভূমির সাথে আরিশ উপত্যকার সংযুক্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং বলা হয়, প্যালেস্টাইনের পূর্ব অংশ এর দক্ষিণ অংশ থেকে মোটেই ছোট নয়, যা ৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পরিব্যপ্ত। আমরা যদি এটাকে আল-আরিশের সঙ্গে যুক্ত করি, তাহ'লে এর আয়তন দাঁড়াবে ৯০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।[২৪]

---

২৩. Rabinovitch, p. 75.
২৪. Palestine Magazine, 3rd Vol. No. 17.

ইতিপূর্বে বর্ণিত স্বস্তি পরিষদের (Peace congress) নিকট পেশকৃত স্মারকলিপিতে ইহূদীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, দক্ষিণ সীমানা অবশ্যই মিসরীয় সরকারের অর্থাৎ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পাবে। ইহূদীদের নিকট সিনাই উপদ্বীপ প্যালেস্টাইনের নিকটতম প্রস্তর ধাপ (Stepping stone) এবং তারা সিনাইকে তাদের ধর্মীয় পূর্বস্মৃতির গভীর অনুভূতির সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

বস্তুতঃপক্ষে ইহূদীরা ইস্রাঈল রাষ্ট্রের সীমানা সুয়েজ খালের পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করার ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হয়নি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনের উপর আরোপিত বেলফোর ম্যাণ্ডেটের (৯৯ বৎসরের) সময়কালের মধ্যে তারা তাদের অবিরত প্রচেষ্টা জোরদার করে।

ইহূদীরা সর্বদা অত্যন্ত সজাগ, কিভাবে এক আরব রাষ্ট্রকে অপর আরব রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা যায় এবং যেকোন মূল্যে আরব ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়। ইহূদীরা সিনাই উপদ্বীপ ও আল-আরিশ এলাকা দখলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এই লক্ষ্য হাছিলের কোন প্রচেষ্টাই তারা বাদ দেয় না। যারা মাইনার তেশানজেনের (Meiner Teshangen) স্মৃতিকথা পড়েছেন, তারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।[২৫]

১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে ইস্রাঈলের উপর্যুপরি দুঃসাহসিক মিসর অভিযান সম্ভবতঃ সময় ও সুযোগমত সিনাই ও আরিশ এলাকা দখলের পূর্ব-পরিকল্পিত নীল নকশারই অংশ।[২৬]

১৯৬৭-এর যুদ্ধের পর ইস্রাঈল শের্ম আল-শেইখ এলাকায় ০পর্যটন পরিকল্পনাসমূহ গড়ে তুলতে শুরু করে এবং সিনাই অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের চেষ্টা চালায়। সিনাইয়ের সেন্ট ক্যাথেরিন মঠের আর্চ বিশপ তখন গীর্জাসমূহের নেতৃবৃন্দের কাছে এই বলে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন যে, ‘এই পবিত্র মঠটি চঞ্চল সেনাবাহিনীর পদভারে কম্পিত গ্যারিসনে রূপান্তরিত হ’তে চলেছে। বিগত পঞ্চদশ শতাব্দীকাল ধরে এই স্থানটি উপাসনাকারীদের পবিত্র তীর্থ

২৫. R. Menier Teshangan, Middle East Agenda, 1917–1956, London 1959.
২৬. Zionist expansion intentions P. 89–91.

Contents

হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। অথচ এবারই প্রথম এটিকে অপবিত্র করা হচ্ছে। ইহূদীরা মঠের নিকটেই দু'শ কামরার একটি হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে, যা ভবিষ্যতে নাইট ক্লাবে পরিণত হবে। যেখানে তারা সারারাত মদ খেয়ে মাতলামি করবে আর দিনের বেলা উলঙ্গ হয়ে সূর্যস্নান করবে'।

এগুলো ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলীকৃত এলাকা থেকে সরে না আসার ব্যাপারে ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত দলীল।

তবে মিসরে ইস্রাঈলের আগ্রাসী লক্ষ্য আরো আগেকার। তাদের লক্ষ্য সুয়েজ খাল দখল করা, যাতে ওটাকে নিজেদের ও উপনিবেশিক শক্তিগুলোর স্বার্থে ব্যবহার করা যায় এবং যাতে উপনিবেশিক শক্তিসমূহ এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে সুয়েজ খালের উপর খবরদারীর ব্যাপারে ভবিষ্যতে তাদের পথ উন্মুক্ত থাকবে। এর ফলে মিসর তার একটি বিরাট আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হবে এবং যা একচেটিয়া ভোগ করত উপনিবেশিক শক্তিগুলো। এসব ছিল ১৯৫১ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে নেওয়ার আগেকার ঘটনা। ইস্রাঈলের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল ডেল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করা। যাতে নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ইস্রাঈল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তাদের সফল হয়।

(৫) ইরাকে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য (Zionist aggressive aims Towards Iraq (P. 34) :

লর্ড রথচাইল্ড নামক একজন ইহূদী পুঁজিপতির নিকট আরিশ, সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাস দ্বীপ[২৭] ইহূদী অভিবাসীদের বসতি স্থাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত নকশা হার্জেল একটি চিঠির মাধ্যমে ১৯০২ সালে প্রেরণ করেন। ইহূদী নেতা হার্জেল উক্ত চিঠিতে এ বিষয়ে খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইহূদী বসতি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল রাজনৈতিক। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী ঐ এলাকায় ইহূদী কলোনী স্থাপন তাদেরকে প্যালেস্টাইনে খুঁটি গাড়তে উৎসাহিত করবে। এই সঙ্গে হার্জেল সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরাকে কলোনী স্থাপনের একটি গোপন পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

২৭. ভূগোলে উল্লেখিত সাইপ্রাস দেশ নয়। বিস্তারিত দেখুন Lexicon of the countries, P. 7-26. এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আরবী সূত্রসমূহ।

উল্লেখ্য যে, ইরাকে কলোনী স্থাপনের উক্ত পরিকল্পনা হঠাৎ করে পেশ করা হয়নি। ১৯০৩ সালের ৪ঠা জুন তারিখে তৎকালীন ওছমানীয় খেলাফতের অধীনে মিসরের প্রধানমন্ত্রী ইয্যত পাশার নিকটে হার্জেল কর্তৃক লিখিত একটি পত্রে ইরাকে ও একর (Acre) যেলাতে ইহূদী অভিবাসনের অনুমতি দান ও এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা না দেওয়ার বিষয়ে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।[২৮]

ইরাকে ইহূদী আগ্রাসী লক্ষ্য শুরু হয় 'আন্তর্জাতিক ইহূদী সংস্থা' গঠনের উষাকাল থেকেই।[২৯] তখন থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, যে সময়ে ইরাকের অধিকাংশ ইহূদী অধিবাসী অধিকৃত প্যালেস্টাইনে হিজরত করে। ইহূদীরা সে সময়ে একটি বড় ধরনের উদ্যোগ নেয় এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করে। তারা সৌধ নির্মাণের জন্য শহরে বহু জমি ও কৃষিকাজের জন্য বহু কৃষি জমি ক্রয় করে। তাদের এই অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার লাভ করে দীওয়ানীয়ার পাহাড়ী এলাকায় ডেহুক, নাছিরা ও আমারা অঞ্চলে যেখানে তারা সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি ক্রয় করে।

তারা খোদ বাগদাদেও বিরাট এলাকা কিনে নেয়। বিশেষ করে কাররাদার (Karrada) পূর্ব উপশহর এলাকায়। তবে সুখের বিষয়, আযমেই (Azmieh) এলাকার বাসিন্দারা ইহূদীদের গোপন অভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং তাদের নিকট জমি বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৮ সালে ইহূদীরা ইরাক ছেড়ে চলে আসার সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল এই বলে যে, 'সেদিন অচিরেই আসবে, যেদিন আমরা পুনরায় ইরাকে ফিরে আসব এবং আমাদের ভূমি ও সম্পত্তির উপর দাবী উত্থাপন করব'।

ইহূদীদের সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা শুধু মাত্র নীল নদ ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং টাইগ্রীস নদীর এলাকাসহ সমগ্র ইরাককে কলোনী বানানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে। যাতে তাদের সীমানা উত্তর ও পূর্ব ইরাকে যথাক্রমে তুর্কী ও ইরানী সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে পারে। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন জেরুযালেম দখলের দিন (তৎকালীন ইস্রাঈলী

---

২৮. Hertzel's memoirs P. 1503-4.

২৯. ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাস্ল নগরীতে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) মোশে দায়ান (Moshe Dayan) ঘোষণা করেন, 'আমরা জেরুযালেম অধিকার করেছি এবং এখন ইয়াছরিব (মদীনা) ও বাবেল (ইরাক) দখলের পথে রয়েছি'।

(৬) সঊদী আরবে ও আরব উপসাগরে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য (Zionist aggressive aims in Saudi Arabia and the Arab Gulf (P. 36) :

ইহূদীরা সর্বদা আক্বাবা উপসাগর তীরবর্তী সঊদী ভূমিসমূহ দখলের আশা পোষণ করে। যাতে পূর্ব সীমান্তে ৯৫ মাইল দীর্ঘ একটি নিরাপদ বাউণ্ডারী সৃষ্টি হয়। ইস্রাঈল আক্বাবা উপসাগরকে একটি হ্রদে পরিণত করতে চায়, যা লোহিত সাগর এবং প্রাচ্যের আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। ইস্রাঈল তার প্রভাব বলয় দক্ষিণে বহু দূরবর্তী মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চায় এই অজুহাতে যে, এই অঞ্চলসমূহ এককালে তাদেরই ছিল এবং সেখান থেকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাদেরকে বের করে দিয়েছিলেন।

তারা আরও উচ্চ আশা পোষণ করে যে, তাদের সীমানা বর্ধিত হবে মদীনা থেকে ১১২ মাইল দক্ষিণে ইয়াম্বু (Yambu) বন্দর পর্যন্ত এবং নাজদের তৈলকূপ এলাকা পর্যন্ত। এর পিছনে তারা এই উদ্ভট দাবী পেশ করে যে, আরবদের তুলনায় তারাই তেল সম্পদের ব্যবস্থাপনায় অধিক যোগ্যতার অধিকারী।

ইহূদীরা আরব সাগর তীরবর্তী আমীর শাসিত ও শেখ শাসিত এলাকাসমূহ নিজ অধিকারে আনতে চায়। যাতে এই এলাকার তৈলখনি গুলিকে কাজে লাগানো যায় এবং ভারত ও দূরপ্রাচ্যের এশীয় দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এই এলাকাকে ব্যবহার করা যায়। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন জেরুযালেম দখলের পর মোশে দায়ান ঘোষণা করেছিলেন, The way to Medina and Mecca is now open to us. (p. 37) 'মদীনা ও মক্কা দখলের পথ এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত'।

আরব দেশসমূহে ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী লালসার কোন শেষ নেই। তারা দাবী করে যে, আরব দেশসমূহের অগাধ সম্পদ ভোগ করার ন্যায্য হকদার তারাই। কেননা তারাই এসব দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বহন করে এনেছে এবং তারাই আরবদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারণ।

ইহূদীদের আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের পিছনে উদ্দেশ্য
(The motives behind Zionist aggressive expansion aims (P. 37)

ইহূদীদের আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের পিছনে মূল উদ্দেশ্যসমূহকে চারভাগে সাজানো যেতে পারে। যথা : (১) মতবাদগত (২) সামরিক (৩) অর্থনৈতিক এবং (৪) রাজনৈতিক।

১. মতবাদগত কারণ (The Dogmatic factor (P. 38) :

ইহূদী সম্প্রসারণবাদী প্রেরণা সরাসরি ভিত্তি লাভ করেছে তাদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে। যার উপরে ভিত্তি করে ইহূদী মতবাদ অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্বের অন্য সব এলাকা বাদ দিয়ে প্যালেস্টাইনকে তাদের ঐতিহাসিক জাতীয় ভূমি হিসাবে নির্বাচন করার মূলেও এই ধর্মীয় কারণ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

১৮৯৭ সালে প্রথম ইহূদী কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে হার্জেল বলেন, ইহূদীরা তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে যাবার আগে তাদের ইহূদী মন্দিরে গমন করবে। The Jewish state (ইহূদী রাষ্ট্র) শিরোনামে একটি প্যাম্ফলেটে হার্জেল লেখেন, Faith unifies us 'ধর্মবিশ্বাস আমাদের ঐক্যবদ্ধ করছে'।[৩০] তিনি আরও লেখেন যে, আমি আমার সন্তানদেরকে 'ঐতিহাসিক খোদা' (Historical God) বিশ্বাসের উপরে লালন-পালন করতে চাই। তিনি বলেন, খোদা আমাদেরকে কখনোই পিছনে রেখে আসা যুগে ফেলে রাখবেন না। তিনি কি আমাদের ভাগ্যে মানব ইতিহাসে কোনরূপ ভূমিকা পালনের সুযোগ রাখেননি?[৩১] ইস্রাঈলে বর্তমানে কয়েকটি শক্তিশালী ধর্মীয় পার্টি রয়েছে। যেমন মিযরাহী (Mizrahi) পার্টি, লেবার মিযরাহী পার্টি, এগোডাট (Agodat) পার্টি ও লেবার এগোডাট পার্টি।

(ক) মিযরাহী পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ (P. 39) :

'আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অবশ্যই আমাদের স্বর্গীয় ঐতিহ্যগত সম্পদ অনুযায়ী হ'তে হবে। আমাদের আইন অবশ্যই ইহূদী ধর্মীয় বিধানের

---

৩০. Theoder Hertzel, The Jewish state: An attempt at a modern solution of the Jewis question. Translated by Sylvic D. Avigdor 4th edition (London 1946) P.54 and P. 71.

৩১. পূর্বোক্ত ৫৪ পৃ.।

উপর ভিত্তিশীল হ'তে হবে। আমাদের প্রধান পুরোহিত অবশ্যই এমন মর্যাদা সংরক্ষণ করবেন, যা সংগতিপূর্ণ হবে বিভিন্ন দেশের সেরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের প্রাপ্য উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে। এছাড়া শনিবার অবশ্যই তাদের ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত হবে'।

(খ) এগোডাট পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি নিম্নরূপ (P. 39) :

ইস্রাঈলী জনগণ সৃষ্টি লাভ করেছে সিনাই পাহাড়ে, যেখানে তারা তাওরাত (The Bible) লাভ করে। ইহূদী রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে কখনোই সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সে তাওরাতের মূল উদ্ধৃতিসমূহ ঠিক মত পালন করে চলবে এবং সে কোনক্রমেই তার সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সক্ষম হবে না একমাত্র তাওরাতের মাধ্যম ছাড়া। সকল প্রকারের শিক্ষাসূচী অবশ্য তাওরাতের দেওয়া নকশা অনুযায়ী হ'তে হবে। ইহূদী জনগণ অবশ্যই দৃঢ়ভাবে পালন করবে তাদের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান, শনিবারের ছুটি এবং উৎসব অনুষ্ঠানসমূহ। তাদেরকে অবশ্যই ইহূদী জীবনের অকৃত্রিমতা বজায় রাখতে হবে। যাবতীয় নাগরিক আইন অবশ্যই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং সমস্ত প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব অবশ্যই পুরোহিতদের হাতে থাকবে।

(গ) এগোডাট লেবার পার্টির মূলনীতির কিছু উদ্ধৃতি নিম্নরূপ (P. 40) :

'ইস্রাঈল অন্যান্য দেশের মত একটি দেশ নয়। তাওরাতের (The Bible) শাশ্বত বিধানসমূহই ইস্রাঈলী জনগণের ও রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সংবিধান (Natural Constitution)। পবিত্র তাওরাতের বিধান ব্যতীত অন্য কোন আইন ও বিধান আমাদের প্রণীত আইনসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। জনগণ এবং রাষ্ট্র মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। ইস্রাঈলের এই পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, কেবলমাত্র তাওরাতের নীতিনির্দেশ ও আইনসমূহ পালন করা ছাড়া। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসাবে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। যদিও সেনাবাহিনীর প্রভাব দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে না। বরং সেনাবাহিনী অবশ্যই পরিচালিত হবে ইস্রাঈলের মূল প্রেরণা (Original spirit) দ্বারা, যা খোদায়ী শক্তি দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোন অস্ত্রের শক্তি দ্বারা নয়'।[৩২]

---

৩২. The existence of a strong army is an important pre-requisite for the maintenance of world peace, yet the military spirit must not affect the

Contents

(ঘ) মিযরাহী লেবার পার্টির কিছু মূলনীতির উদ্ধৃতি নিম্নরূপ (P. 40) :

'পবিত্র তাওরাত (The Bible) অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন-কানূনকে অবশ্যই তাওরাতের উপর ভিত্তিশীল হ'তে হবে'।[৩৩]

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী সফরে গিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পম্পিডু (Pompidou) ইস্রাঈল সম্পর্কে বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রাঈলের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। কিন্তু যদি সে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় রাষ্ট্র না হয়ে অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রগুলোর মত হ'ত, তাহ'লে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি হ'ত'। এই সময় আন্ত র্জাতিক ইহূদীবাদ ধর্মের প্রতি খুবই আগ্রহ দেখায়। অন্যদিকে অন্যান্য দেশে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগায়। যাতে ঐসব সরকারের নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়।

ইহূদী আন্দোলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দু'টি মৌলিক দাবীর উপরে জোর দেয়, যা তারা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না।-

১. নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের ভাষায় The promised land or the land of Israel অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ভূমি অথবা ইস্রাঈল ভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইহূদী জনগণকে তাদের জাতীয় ভূমিতে (National land) ফিরে আসা। কেননা প্যালেস্টাইনের বাইরে নির্বাসনে জীবন যাপন করা ইহূদী জনগণের ধর্ম বিশ্বাস ও স্বাভাবিক জীবন ধারার বিরোধী। ইহূদী ইতিহাসের সকল পর্যায়ে তাদের অঘোষিত লক্ষ্য ও পথ নির্দেশক নীতি সর্বদাই ছিল এই যে, 'স্বীয় লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে যা পারো করে যাও। তোমার নগদ ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় যেকোন সুযোগ গ্রহণ কর'।[৩৪]

---

state and the army must be governed by the original spirit of Israel which is capable of elevation and exaltation through God's spirit and not through power. p. 40.

৩৩. The Bible should be condition of organization of the state and the laws of the state must be based upon the Bible. p. 41.

৩৪. Obtain whatever you can, without giving up any of your objectives; take advantage of everything in an effort to realize both your immediate and long term objectives. p. 42.

ইহূদীবাদ (Zionism) সব সময় নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব ভূমিতে ইহূদীদের অধিকার বজায় রাখতে চেয়েছে। যদিও তাদের এই 'ন্যায্য অধিকার সমূহের' (Legal rights) দাবী কালের আবর্তনে সাময়িকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

'হিরট' (Hirout) পার্টির নেতা ও (বর্তমান ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী) ইহূদী সন্ত্রাসবাদী (Zionist terrorist) মেনাহিম বেগিন The Revolt (বিদ্রোহ) নামক স্বীয় বইয়ে লেখেন, তাওরাতের অবতরণকাল থেকেই এই মাটি ইস্রাঈলের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট, যা পরবর্তীকালে 'প্যালেস্টাইন' নামে অভিহিত হয়েছে এবং এটা সবসময় জর্ডান নদীর দুই তীরকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেজন্য প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করা অন্যায় এবং সে অবস্থায় তা কখনোই আইনগত স্বীকৃতি পেতে পারে না। এর বিভক্তির চুক্তিতে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর থাকলেও তা কখনোই আইন সম্মত হবে না। বরং ইস্রাঈলী ভূমি সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য ইস্রাঈলী জনগণের অধিকারেই ফিরে আসবে।[৩৫]

১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিল মেনাহিম বেগিন বলেন যে, আমরা কোন শান্তিচুক্তি করি বা না করি, যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত ইস্রাঈল এমনকি আরব জনগণের জন্যেও কোন শান্তি আসতে পারে না।[৩৬]

১৯৫৭ সালের ১৬ই আগস্ট ২৩তম ইহূদী সম্মেলনে (Zionist Congress) আমেরিকান ইহূদী নেতা আবা হিল্লেল সিলভার (Ebba Hillel Silver) বলেন যে, ইস্রাঈল রাষ্ট্র এখনো ছোট ও অমীমাংসিত (Unsettled)। অতএব আমাদেরকে এর মোকাবেলায় সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত।[৩৭]

১৯৫১ সালের ৮ই আগস্টের ইহূদী সম্মেলনে ইস্রাঈল সরকারের পক্ষ থেকে এক বক্তৃতায় ধর্মমন্ত্রী রাব্বী ইহূদা মায়মূন (Rabbi yehuda maimon)

---

৩৫. Menahim Began, The Revolt, London 1950, p. 335.
৩৬. Israel an economic, military and political danger. Beirut, p. 31.
৩৭. Ibid. P- 12.

Contents

বলেন যে, আপনাদের এই সম্মেলন বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে ঐসব সমস্যা বিবেচনা করবে, যেগুলো পূর্ণাঙ্গ ইস্রাঈল রাষ্ট্র সম্পর্কিত, যা বিস্তৃত হবে ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদ পর্যন্ত।[৩৮]

১৯৪৮-এর যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই বেন গুরিয়ন (Ben Gurion) বলেন, যে তরবারী আজ খাপের মধ্যে ফিরে এসেছে, তা অত্যন্ত অস্থায়ীভাবে এসেছে। আমরা একে আবার ব্যবহার করব যখন আমাদের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হবে অথবা যখন তাওরাতের নবীগণের স্বপ্ন বিপদগ্রস্ত হবে। সকল ইহূদী জনগণ তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমিতে বসতি স্থাপনের জন্য অবশ্যই ফিরে আসবে যা নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত হবে'।

১৯৫০-৫১ সালে ইস্রাঈলের বার্ষিক সরকারী রিপোর্টের ভূমিকায় বেন গুরিয়ন বলেন, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কোন বড় একটা দেশ লাভ করিনি। বরং দীর্ঘ ৭০ বৎসরের কঠিন সংগ্রামের পর আমরা আমাদের ছোট দেশটির স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে পৌঁছেছি মাত্র।[৩৯]

ইস্রাঈলের বার্ষিক সরকারী বই ১৯৫২-এর ভূমিকায় বেন গুরিয়ন ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণা করেন,

'প্রত্যেকটি দেশই একটা নির্দিষ্ট ভূমি ও জনগণ নিয়ে গঠিত। ইস্রাঈলও এই নীতির ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে তার ভূমির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ অবস্থায়। যখন আমাদের রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখন পূর্ণ ইস্রাঈলী ভূমির মাত্র একটি অংশে তা স্থাপিত হয়, যা সর্বমোট ইহূদী জনসংখ্যার মাত্র ০৬% শতাংশ ধারণ করতে সমর্থ হয়।[৪০]

প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের উপর সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তারের উদ্ধত অঙ্গীকার ইহূদী নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাড়িয়ে খোদ ইস্রাঈলী সরকারের মুখেও শোনা যায়। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ইস্রাঈলের সরকারী বইয়ে বলা হয় যে, একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি দ্বারা কোনক্রমেই ইস্রাঈলের প্রাকৃতিক সীমানা-কাঠামোকে ধ্বংস করতে দেওয়া যায় না।[৪১]

---

৩৮. Ibid. P- 31.

৩৯. Ben Gerion's speech of 7th June, 1949.

৪০. Introduction to the annual book of the Israeli Govt. for the year 1952. P. 15.

৪১. Annual book of the Israeli Govt. for the year 1955. P. 230.

১৯৫৬ সালে মিসরের উপরে ত্রয়ী হামলার মাত্র ৯ দিন পরে বেন গুরিয়ন ইস্রাঈলী পার্লামেন্টে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, ইস্রাঈলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুঃসাহসিক আক্রমণ আমাদের স্বদেশ ভূমি ও সিনাই পাহাড়ের সঙ্গে বন্ধনকে নবায়ন করেছে।[৪২]

বেন গুরিয়ন বিগত ২০ বৎসর যাবত পুনঃ পুনঃ এ কথার উল্লেখ করেন যে, জেরুযালেম ছাড়া ইস্রাঈলের কোন অর্থ হয় না এবং ধর্মমন্দির (Temple) ছাড়া জেরুযালেমের কোন অর্থ হয় না। বেন গুরিয়ন এখানে ধর্মমন্দির অর্থে কি বুঝিয়েছেন? নিশ্চয়ই তা আল-আক্বছা মসজিদ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৩]

ইস্রাঈলী স্কুলসমূহে ভূগোলের একটি পাঠ্য বইয়ে শেখানো হয়েছে (P. 46) :

১৯৪৯ সালের শান্তি আলোচনায়[৪৪] ইস্রাঈলী প্রতিনিধি দল ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ইস্রাঈল ও এর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পার্টিশন স্কীমের ভিত্তিতে যে মীমাংসা নির্ধারণ করা হয়, আরব আগ্রাসনের ফলে ঐ সীমানা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৫]

আবা ইবান (Ebba Iban) বলেন, আমরা সর্বদা আমাদের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখব জর্ডান এবং এর পানির উৎসগুলির উপর।[৪৬]

উপরের ঘোষণাসমূহ এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ইস্রাঈলের উন্নতি, এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বণ্টন, এর কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সবকিছুই তার সরকারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করছে। জর্ডান নদীর পানি এবং লেবানন,

---

৪২. Jerusalem post newspaper, Nov. 8, 1956.

৪৩. ইস্রাঈলের প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি ১৯৬৯ সালের ৫ই আগস্টে সমাপ্ত সপ্তাহব্যাপী নির্বাচনী অভিযানে নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা কখনোই জেরুযালেম, গাযা, গোলান মালভূমি, সিনাই-এর বৃহত্তর এলাকা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর থেকে হটে আসবে না। তারা জর্ডান নদীকে ইস্রাঈলের জন্য নিরাপদ পূর্ব সীমানা বলে মনে করে।

৪৪. ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ রোডস-এ এই শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে আরব ভূমির বহু এলাকা যা ইতিপূর্বে ইস্রাঈলীদের অধিকারে ছিল না, তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হ'ল জেনিন যেলার একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড।

৪৫. Jerusalem post Issue of 2-5-1951.

৪৬. Jerusalem post newspaper Issue, dated 10.7.51.

সিরিয়া ও জর্ডানের অন্যান্য পানির উৎসসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের নাজাব মরুভূমিকে কাজে লাগানোর জন্য ১৯৬৭-এর যুদ্ধে ইস্রাঈলী সেনাবাহিনী সিরিয়া ও জর্ডানের কতকগুলো পানির উৎসের উপর দখল কায়েম করতে সমর্থ হয়।

মোটকথা ইহূদী আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদের পিছনে পানিই একমাত্র অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয়। বরং ইস্রাঈলের ব্যবসায় সমস্যা, ইস্রাঈলী পণ্য সমূহের বাজার সৃষ্টি এবং আরবদের অর্থনৈতিক অবরোধ ভেঙ্গে দেওয়া পানির উৎসসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৯৫১ সালে দেওয়া এক বক্তৃতায় বেন গুরিয়ন ঘোষণা করেন, 'আমরা অবশ্যই 'আইলট' বন্দর (Harbour of Eilat) প্রতিষ্ঠা করব এবং ভারত মহাসাগরে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করব। আমরা তা সম্পাদন করব আমাদের আকাশ, নৌ ও স্থল বাহিনীর সাহায্যে।[৪৭]

বেন গুরিয়ন উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালান ১৯৫৬ সালে সিনাই ও গাযা সেক্টরে ত্রয়ী হামলা চালানোর সময়। বেন গুরিয়নের ভাষায় উক্ত হামলার পিছনে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল :

১. সিনাই উপদ্বীপে শত্রুশক্তি ভেঙ্গে দেওয়া।

২. পূর্ব পুরুষদের ভূমি উদ্ধার করা। যা বিদেশী অধিকারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ।

৩. আক্বাবা উপসাগর ও সুয়েজ খালে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।[৪৮]

১৯৬৭ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (মিসর) যখন আক্বাবা উপসাগরে ইস্রাঈলী জাহায চলাচল নিষিদ্ধ করে, তখন ইস্রাঈল আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং জোর করে আক্বাবা উপসাগরে তার জাহায পুনরায় চালু করে। কারণ এই নৌ-চলাচলের স্বাধীনতাকে ইস্রাঈল তার অর্থনীতির জন্য জীবন রক্ষাকারী হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

---

৪৭. Ephrain Orny Walisha Ephrai (Geography of Israel): translated into English by the Israeli office for scientific translations, Jerusalem, 1964. P. 170.

৪৮. Jerusalem post newspaper. Issue dated 9.11.56.

আক্বাবা উপসাগরে জাহায চলাচল বন্ধ করা হ'লে ইস্রাঈল বঞ্চিত হবে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার বিরাট ব্যবসা থেকে।

যারা ১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের ইহূদীদের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের লেখা পড়েছেন, তারা অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন যে, এই নেতাদের ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবিরত প্রচেষ্টা ও তা রক্ষার জন্য বিরামহীন সামরিক প্রস্তুতির পিছনে মুখ্য কারণ হিসাবে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই ক্রিয়াশীল ছিল।[৪৯]

ইস্রাঈলী সরকার ও লেখকগণ বিশ্ব ইহূদী সম্প্রদায়ের প্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রে হিজরত করার জন্য উৎসাহিত করেন ও আহ্বান জানান এবং সেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তারা তাদেরকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, যা তাদেরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এনে দেবে। ইহূদী নেতারা একই সুরে বার বার একই কথা উচ্চারণ করতে থাকেন। কোন বস্তুই তাদেরকে এই ধরনের কথাবার্তা থেকে একবিন্দু নড়াতে পারে না।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শেষে শান্তিচুক্তির সময় তাদের দেওয়া দফাগুলোতে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ প্রথম সারিতে স্থান পায়। এই দফাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. আক্বাবা উপসাগরে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সাগর তীরবর্তী সিনাই মরুভূমির পশ্চিম অংশ ও (মিসরের) শারম আল-শেখের উপর ইহূদী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

২. সুয়েজ খালে জাহায চলাচলের স্বাধীনতা।

৩. জর্ডান নদীর উৎসসমূহের উপর ইহূদী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

৪. আরব অর্থনৈতিক বয়কটের সমাপ্তি টানা।

আরবরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এসব দফা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা এসব প্রস্তাব মেনে নেওয়া অর্থ পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।

---

৪৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'Days prior to the decisive battles and after it', Beirut 1967, P.34-42.

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থনৈতিক তাকীদেই ইস্রাঈল আরব দেশসমূহে বার বার আগ্রাসন চালায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই তাকীদই ইস্রাঈলী সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫০]

২. সামরিক কারণ (The military factor p. 50) :

এটা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, ইস্রাঈল তার সমস্যার সামরিক দিকটির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। কেননা ইস্রাঈলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য রয়েছে (এবং তারা ভাল করেই জানে যে), আরবরা তাদের ভূমি, মর্যাদা ও ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে অবশ্যই মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং তারা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অধিকৃত আরব ভূমি ফিরে পাবে।

ইস্রাঈলী সীমানাসমূহের প্রকৃতি, অধিকৃত ভূমির আয়তন, জনসংখ্যা বণ্টন, পূর্ব পুরুষদের ভূমি পুনর্দখলের জন্য ইস্রাঈলের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং শত্রু ভাবাপন্ন আরব দেশগুলোর মাঝখানে অন্যায়ভাবে আরব ভূমি দখল করে রাখা প্রভৃতি কারণে ইস্রাঈল সামরিক বিষয়টিকে অন্যতম অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করে থাকে।

ইস্রাঈলের সামরিক নীতি-কৌশলের সমালোচনা করার অপরাধে আদালতে জনৈক ইস্রাঈলী লেখকের বিচার হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে উক্ত গ্রন্থকার আদালতকে বলেন :

‘আমি দেখেছি যে, রাষ্ট্র একদল অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মান্ধ যুবদল সৃষ্টি করার জন্য তার পূর্ণ প্রচেষ্টা জোরদার করছে। যারা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করবে এবং অবশেষে নিজেদেরকে সরাসরি যুদ্ধ এবং আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রতি নিয়োজিত করবে। এই সংকীর্ণ ও গোঁড়া সামরিক শিক্ষা, যা তারা লাভ করছে, তা মোটেই পৃথক নয় ঐসব শিক্ষা থেকে, যা দেশে দেশে সামরিক শাসনের অধীনে দেওয়া হয়ে থাকে। জাপানী ও নাৎসীদের ন্যায় এরাও একটি বিশেষ আদর্শে সৈন্যদের গড়ে তুলবার মানসে দেশের যুব সমাজকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করছে। এমনকি তারা ছোট শিশুদেরকেও

৫০. See details in 'Israel's Militarism' Beirut, 1968, p. 63–65.

সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে কছূর করছে না। তারা দেশের সবকিছুতেই সামরিক চেতনার ছাপ রাখতে চায়। যে ছাপ তারা মারতে চায়, সে ছাপ হ'ল আক্রমণ-অভিযানের এবং কলোনী স্থাপনের'।[৫১]

যাবতীয় বস্তুগত ও নৈতিক সম্ভাবনাসহ সমস্ত ইস্রাঈলকে একটি বিরাট সৈন্য শিবির বলা যায়। কোন ইহূদী বালক ১২ বৎসর বয়সে পা দিলেই তার নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। ১৮ বৎসর পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ চলে। তারপর তাকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয় একটি বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্স (term) শেষ করবার জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত সৈনিক সেনাবাহিনীর রিজার্ভ সেকশনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে তার ৩৯ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রয়োজনমত যেকোন সময়ে যেকোন সামরিক কাজে নিয়োজিত হ'তে বাধ্য থাকবে। ৩৯ বৎসরের পর সে বিভিন্ন কলোনীতে ন্যাশনাল গার্ড সার্ভিসে যোগ দেবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে অস্ত্রবহনের ক্ষমতা রাখবে ততদিন সে উক্ত চাকুরীতে বহাল থাকবে। এভাবে ইস্রাঈলে সামরিক চাকুরী শুরু হয় শিশুকাল থেকেই এবং তা শেষ হয় তার মৃত্যুর সাথে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইস্রাঈল তার মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশকে সক্রিয় সামরিক কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়মিত সেনাবাহিনীর বাইরে অস্ত্র বহনে সক্ষম প্রত্যেক ইস্রাঈলীকে দেশ রক্ষার জন্য রিক্রুট করা হয়।

অন্যদিকে আরবরা মাত্র তিন হাযার সৈন্য এদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিল।

ইস্রাঈল তার যাবতীয় নৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ আরবরা কি করেছিল? ইস্রাঈলের এই সামরিক কারণের পশ্চাতে উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) নৈতিক সমর্থন (Moral support p. 52) : ইস্রাঈল সর্বদা তার যুদ্ধরত সেনাবাহিনী ও জনগণের মনোবল উঁচু রাখতে চায়। অন্যদিকে সে আরব শক্তি ও আরব জনগণকে ধ্বংস করতে চায়।[৫২]

---

৫১. In the Tel-Aviv court on 19.4.1951. See the book entitled 'The road to victory in the Battle of revenge' p. 128.

একটি উঁচু মনোবলসম্পন্ন সেনাবাহিনী যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে জয় লাভ করে। ইস্রাঈলী সেনাবাহিনীকে তার পরিচালনা, সংগঠন, অস্ত্রসজ্জা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তুগতভাবে এবং ইহূদী ধর্মের আইন-কানূন ও নীতিশিক্ষা সমূহ গভীরভাবে অনুধাবন এবং ইহূদী উত্তরাধিকার ও হিব্রুভাষার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শনের আহ্বানের মাধ্যমে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়। শুধু সেনাবাহিনী নয়; বরং ইস্রাঈল ও ইস্রাঈলের বাইরে বিশ্বের সকল প্রান্তের ইহূদী জনগোষ্ঠীর মনোবল এর দ্বারা উন্নত হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু বৎসরের অপমান ও নিগ্রহ ভোগের প্রেক্ষাপটে ইস্রাঈল বা ইহূদীরা এখন সবচাইতে প্রয়োজন উপলব্ধি করছে তাদের নৈতিক উন্নতির।

ইহূদীরা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। তারা মিথ্যা প্রতিমা সমূহের পূজা করত[৫৩] এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে অন্যের উপর অত্যাচার করত এবং তাদের নিজেদের গোত্রীয় নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাদের শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন এবং আসীরিয়রা খৃঃ পূঃ ৭২১ সালে ইস্রাঈলের রাজত্বকে ও ব্যবিলনীয়রা খৃঃ পূঃ ৫৮৭ সালে ইয়েহূদা (Yehuda) রাজত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের ধর্মমন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং জীবিত সকলেই বন্দী হয়। ইহূদীরা বন্দী জীবনে দারুণ নির্যাতন ভোগ করে যতদিন না পারসিকরা (Persians) তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে খৃঃ পূঃ ৫৩৮ সালে জেরুযালেমে প্রত্যাবসনের ব্যবস্থা করে।

ইহূদীরা তাদের বিগত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা তাদের নবীদের হুঁশিয়ারী ও উপদেশসমূহের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দেয় বলে মনে হয় না। রোমকরা (Romans) তাদেরকে দু'বার পর্যুদস্ত করেছে। একবার খৃঃ পূঃ ৭০ সালে সম্রাট তিতাস ফ্লাভিয়াসের (Titus Flavious) আমলে। যিনি জেরুযালেম নগরীকে ধ্বংস করেন এবং এর উপসনালয়কে জ্বালিয়ে দেন।

৫২. The Arab Military unity, Beirut 1969, P. 132.

৫৩. তারা সিডনীদের (Sidonites) দেবতা 'আস্তারাউত' (Ashtarout) এবং এমোনিয়দের (Anomites) দেবতা 'ম্যালকমের' (Malcom) পূজা করত। দেখুন : Kings 18th 11 : 6 and 2.

দ্বিতীয়বার খৃঃ পৃঃ ১৩৫ সালে সম্রাট ইলিয়াস হাদিয়ানুসের (Ilius Hadianus) হাতে, যিনি জেরুযালেম নগরীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মহান ইলিয়ার নামানুসারে এর নাম রাখেন 'ইলিয়া কাপিতুলুনা' (Elia Kapituluna)। তিনি এই নগরীর বাসিন্দাদের উৎখাত করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল, তখন তাদের প্রভু যীশুর সাথে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!) দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ হিসাবে তারা ইহূদীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। জেরুযালেম নগরীতে ইহূদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হ'ল এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত ময়লা-আবর্জনা উপাসনালয়ের পাশে স্তূপীকৃত করা হ'ল।

৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ১৭ হিজরীতে মুসলমানগণ এই পবিত্র নগরী অধিকার করেন এবং ইহূদীদের জন্য একটি নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে। যে জীবন ছিল মর্যাদার এবং সম্মানের; যা তারা ইতিপূর্বে কখনোই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

মুসলিম খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) ইস্রাঈলী সন্তানদের বিরোধিতায় রোমানদের দ্বারা স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনাসমূহকে উপাসনালয়ের উপর থেকে নিজ হাতে অপসারণ করেন। তিনি তার ঢিলা বড় জামা বিছিয়ে তাই দিয়ে আবর্জনা মুছতে থাকেন এবং মুসলমানদের এ কাজে সহায়তার জন্য আহ্বান করেন।[৫৪]

মুসলমানগণ তখন তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নবীদের সমাধিগুলোর দিকে এবং শুরু করেন সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে, যিনি সবশেষে জেরুযালেমে সমাহিত হয়েছেন। মুসলমানরা এগুলোকে সাজিয়ে তোলেন এবং এ সবের পবিত্রতা, সৌষ্ঠব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন। রোমান, প্যাগান ও খ্রিষ্টানদের দীর্ঘ রাজত্বকালে চিরদিনের জন্য অধিকার বঞ্চিত ইহূদীরা পুনরায় ফিরে আসতে থাকে মসলিম শাসনামলে, প্রথমতঃ শুধুমাত্র দেখবার

৫৪. Aluns Al-jalil Mujier el Dine el Hanbaly, Cairo 1283 A. H. II : 153, 227. মূল বইয়ে 'Last' কথাটি লেখা আছে। -অনুবাদক।

জন্য, তারপর কাজের জন্য এবং তারপর ক্রমে উপাসনা ও বসবাসের জন্য।[৫৫]

আরব এবং মুসলমানগণ ইহূদীদের সঙ্গে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন যার সাক্ষ্য ইহূদীরাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে যখন তারা একটি সম্মানজনক অবস্থায় উপনীত হ'ল, তখন আরবদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রমাণিত হ'ল।

ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেযার (Nebuchadnezzar) যিনি খৃঃ পূঃ ৫৮৭ সালে ইহূদীদেরকে বন্দী করেন, তখন থেকেই ইহূদীরা ছিল ঘৃণিত ও অবজ্ঞার পাত্র। তাদের না ছিল কোন শক্তি, না ছিল কোন অস্তিত্ব। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিনের ভবঘুরেমি ও উদ্বাস্তু অবস্থা শেষে যেইমাত্র তারা একটি রাষ্ট্র পেল, পেল একটি পতাকা, একটি সরকার এবং পেল দুনিয়ার বুকে একটি সম্মানজনক অবস্থান, অমনি তারা ভুলে গেল সেই বাস্তব সত্য কথাটি যে, তাদের রাষ্ট্রের কখনো কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং এই ফিলিস্তীন কখনোই কোন উপনিবেশবাদীদের জন্য ছিল না। তারা ভুলে গেল এ কথাও যে, তাদের কৃত্রিম সত্তা কখনোই স্থায়ী ছিল না এবং তাদের এখনকার এই বাস্তবতা কখনোই আরবদের দুর্বলতা ও মতবিরোধের কারণে ছিল না। সর্বোপরি তারা এ সত্য ভুলে গেল যে, তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় তাদের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপনিবেশিক শক্তির সহায়তায় বেয়নেটের মুখে।

সুদীর্ঘ ছাব্বিশ শতাব্দীকালের অপমান, বঞ্চনা ও গ্লানিকর অবস্থার ফলে সৃষ্ট হীনমন্যতা ও দুর্বলতা যা তাদের মন-মস্তিষ্ক ও রগ-রেশায় ঢুকে গিয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠবার জন্য তারা একটি সামরিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে, যা কেবলমাত্র শক্তির উপরে বিশ্বাস রাখে এবং তাদের সন্তানদেরকে উৎসাহিত করে প্রলুব্ধকারী সামরিক আকৃতি-প্রকৃতিকে প্রশংসনীয় করবার জন্য। যা একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে তাকে আরও শক্তিশালী ও উন্নতকরণের জন্য। যা তাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সংগঠিত করে এবং সাধারণ নাগরিকদের অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেয়।

---

৫৫. The position of Jerusalem in Islam. Dr. Ishak Moussa el Husseini, Cairo 1969, PP. 58–59.

Contents

১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই ইহূদীরা সারা বিশ্বকে সর্বদা এই ধারণা দেবার চেষ্টা চালিয়ে আসছে যে, আরবদের তুলনায় তারা শ্রেষ্ঠ। যেকোন ধরনের প্রোপাগাণ্ডা ও কূটনীতির মাধ্যমে নিজেদের অপরাজেয় মনোভাবকে সাড়ম্বরে প্রদর্শন করার কোনরূপ প্রচেষ্টা তারা বাদ দেয়নি। ইস্রাঈল এটা করে থাকে বিশেষ করে তার জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য এলাকার ইহূদীদের মাঝে গভীরভাবে বদ্ধমূল দীর্ঘদিনের লালিত হীনমন্যতা দূর করার প্রচেষ্টা হিসাবে।

ইস্রাঈলী সেনানায়কগণ তাদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর বিদেশী সাংবাদিকগণ, যারা সরকারী কিংবা সামাজিক কাজের অজুহাতে তাদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা বলেছেন যে, ইস্রাঈলীরা তাদের সঙ্গে খোদায়ী আচরণ করেছে।[৫৬]

১৯৪৮ সাল থেকেই ইস্রাঈল আরবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আগ্রাসনের কৌশল অনুসরণ করে চলেছে, তার সেনাবাহিনী ও জনগণের নৈতিক মান উঁচু রাখবার জন্য। সে প্রতিটি আরব সামরিক তৎপরতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সর্বদা দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত থাকে এই ভয়ে যে, পাছে লোকে তাদেরকে দুর্বল বলে ব্যঙ্গ করে। অধিকন্তু সে তার জনগণের মনোবল উঁচু রাখার জন্য তাদের ঐতিহাসিক সামরিক দলীলসমূহ মিথ্যাভাবে প্রকাশ করে। ইস্রাঈলী নেতারা আশংকা করে থাকে যে, সেনাবাহিনী ও জনগণের নীচু মনোবল তাদেরকে এক স্নায়বিক পতনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। সে কারণে তারা তাদের সামরিক বিজয়সমূহকে অনেক বাড়িয়ে প্রচার করে জনগণের ও সেনাবাহিনীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা রোধ করবার জন্য।

এটা স্পষ্ট যে, ১৯৪৮-এর পর থেকে আরবদের উপর বিভিন্ন বিজয়ের কারণে ইস্রাঈলীদের মনোবল এখন অনেক উঁচুতে রয়েছে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, মাত্র একটি পরাজয়ের ঘটনা ঘটলেই তাদের সমস্ত মনোবল উবে যাবে। যেকোন একটি পরাজয় তাদেরকে নৈরাশ্য ও ক্রমবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে

৫৬. The Israelis behaved more like Gods than human beings. P. 57.
এখানে 'খোদায়ী আচরণ' বলতে 'চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ' বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক।

যাবে। এমনকি সমুদ্রও তখন তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অদূর ভবিষ্যতে এটা অবশ্যই তাদের জন্য ঘটবে।

(খ) আরব ভূ-খণ্ডসমূহে সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা (Expansion on the account of the Arabs p.58) **:** ইহূদীরা শক্তি ছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তাদের সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য তারা প্রথমেই নির্ভর করে নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর। এ বিষয়ে ইস্রাঈলী নেতারা তাদের আগ্রাসী মনোভাব কখনোই লুকিয়ে রাখেনি। অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার জমা করা, ইস্রাঈলের সমস্ত বস্তুগত ও নৈতিক সম্পদ পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধের কাজে লাগানো প্রভৃতি তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে কঠিন প্রতিজ্ঞার নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে। যা ব্যতীত সে কখনোই তার আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হবে না।

১৯৬৫ সালে একটি আমেরিকান ম্যাগাজিনে লিখিত এক নিবন্ধে (তৎকালীন) ইস্রাঈলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবা ইবান বলেন, এ কথা ধারণা করা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ হবে না যে, আরব নেতারা আমাদেরকে ১৯৬৬ বা '৬৭ সালের সীমানায় ফিরে যেতে যিদ ধরবেন, যেমন তারা যিদ ধরতেন ১৯৪৮ সালের সীমানায় ফিরে যাওয়ার জন্য। যে সীমানা তারা এককালে অস্বীকার করেছিলেন।[৫৭]

ইস্রাঈল তার যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মোট জাতীয় আয়ের বৃহদাংশ ব্যয় করে। শতকরা হিসাবে যা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র, এমনকি আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনায়ও অধিক। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে যুদ্ধের জন্য ইস্রাঈলের সামরিক বাজেট মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। যা ঐ বৎসর চার বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়।

সুইস ফেডারেল ব্যাংক ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তার নিয়মিত মাসিক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, ১৯৬৭ সালের পরে ইস্রাঈলের বার্ষিক সামরিক বাজেটের শতকরা হার পৃথিবীর যেকোন দেশের তুলনায় বেশী। ১৯৬৮ সালের বাজেট ১৯৬৭-এর তুলনায় বেশী ছিল। তেমনি ১৯৬৯-এর বাজেট ৬৮-এর তুলনায় ছিল আরও বেশী।

---

৫৭. 'Foreign Affiars', July 1965.

আমরা যদি ইস্রাঈলের জাতীয় আয়ের সাথে সেই বিরাট অংকের আয় শামিল করি, যা দানের আকারে কেবলমাত্র সামরিক খাতে ব্যয়ের জন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার ইহূদীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে, তাহ'লে আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, এই বিরাট অংক কেবলমাত্র তার আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইস্রাঈল ১৯৬৯ সালের এপ্রিলে ১২টি ফ্যান্টম বিমান এবং ১৯৭০ সালের মে, জুন, জুলাই ও অক্টোবর মাসে আরও ৫৪টি ফ্যান্টম বিমান লাভ করে। এছাড়াও সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে ৮০টি স্কাই হক বিমান ও পাঁচ শত মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ লাভ করেছে এবং এভাবে চুক্তির বাকীগুলো সে পেতে থাকবে বিমানের প্রথম চালান পাওয়ার বেশীর বেশী এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর-এর শেষ নাগাদ।

ইস্রাঈলের বার্ষিক সামরিক বাজেট (Israel's fiscal year defence budget p. 61) :

এছাড়াও ইস্রাঈল নিজ দেশে অস্ত্র উৎপাদনের কোন প্রচেষ্টা বাদ রাখছে না। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ৭০-৭১ সাল পর্যন্ত ইস্রাঈলের মোট জাতীয় বাজেট ছিল মিলিয়ন ডলারের হিসাবে যথাক্রমে ১৬৬৭, ১৬৮০, ২১৪৭ ও ২৮৩১ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৭৫০, ৬২৯, ৮৪০ ও ১১৮৯ মিলিয়ন ডলার।

১৯৬৮-এর মাঝামাঝি নাগাদ তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে ইস্রাঈলী প্রত্যাহার সম্পর্কে তাদের মতামত যাচাই করে একটি জরিপ চালানো হয়। তাতে দেখা যায় যে, শতকরা ৪৪জন সমস্ত অধিকৃত আরবভূমি ইস্রাঈলের সঙ্গে সংযুক্তি সমর্থন করে। শতকরা ৩৭জন সংযুক্তির বিপক্ষে, ১৯ জন কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকা সংযুক্তির পক্ষে এবং মাত্র ২ জন এক্ষুণি ইস্রাঈলী প্রত্যাহারের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে ইস্রাঈল যা কিছু দখল করেছে, তা সে কখনোই ছাড়বে না। আরব শক্তি! হ্যাঁ, কেবলমাত্র আরব শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া।

ইস্রাঈলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যসমূহ হাছিলের জন্য তাদের নেতারা ইস্রাঈলকে একটি সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং সবকিছুতেই সামরিক ছাপ অংকিত করেছে।

১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবর সংখ্যা ইহূদী পত্রিকা হারেজ (Haaretz)-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বেন গুরিয়ন বলেন যে, অধিকৃত জেরুযালেম চিরকালের জন্য ইস্রাঈলের রাজধানী হিসাবে থাকবে, যা ৩০০০ বছর পূর্বে ছিল এবং তা প্রলয়কাল অবধি থাকবে।[৫৮]

১৯৬৯ সালের ৯ই জুন তারিখে লণ্ডন পৌঁছে বেন গুরিয়ন ঘোষণা করেন, ইস্রাঈল কখনোই জেরুযালেম ও গোলান মালভূমি ছেড়ে যাবে না, যদিও অন্যান্য সীমান্তে কিছু পরিবর্তন সম্ভব হ'তে পারে। যতদিন পর্যন্ত না একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ইস্রাঈল কোনক্রমেই তার ছয় দিনের যুদ্ধে দখল করা আরব এলাকা থেকে ফিরে আসবে না।

একই বছরের ২৪শে অক্টোবর লণ্ডনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেন গুরিয়ন পুনরায় বলেন যে, ইস্রাঈল অবশ্যই জেরুযালেম ও গোলান মালভূমি নিজ অধিকারে রাখবে।

লেভি ইস্কল[৫৯] (Levi Eshkol) বলেন, ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় কোনমতেই ফিরে আসা হবে না। বর্তমানের যুদ্ধ বিরতি রেখার কোন পরিবর্তন হবে না, যতক্ষণ না একটা স্থায়ী শান্তিচুক্তির কাঠামোর মধ্যে নিরাপদ সীমানা লাভ করা যায়। আমরা পশ্চিম তীরের কোন বসতি এলাকা যেমন নাবলুস, জেনিন বা অন্যান্য কোন এলাকা আটকে রাখতে চাই না। আমরা যেটার উপর জোর দিতে চাই, সেটা হ'ল জর্ডান নদী সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্য একটি নিরাপদ সীমানা হবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী কেবল ঐ সীমানা বরাবর এলাকাগুলোই দখল করবে।

---

৫৮. Haaretz newspaper, Tel-Aviv. 20. 1, 1970.

৫৯. লেভি ইস্কল (১৮৯৫-১৯৬৯ খৃ.) ইস্রাঈলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি লেবার পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। শেষবারে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ সালে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। -অনুবাদক।

আমরা বিশেষভাবে কোন বিষয়ে জোর করি না। আমরা সিনাইকে অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসাবে দাবী করেছি। তথাপি আমরা 'শেরম আল-শেইখে' একটি ঘাঁটি রেখে দেব যাতে আমাদের পশ্চাদরক্ষী সেনাদল সরাসরি তিরান, (Tiran) এলাকার প্রতিরক্ষায় কাজে লাগতে পারে। আমরা এসব ব্যাপারে কোন চুক্তির উপরে কিংবা কোন বিদেশীর (সেনাবাহিনীর) উপরে ভরসা রাখতে পারি না। জেরুযালেম এবং গোলান মালভূমির ব্যাপারে আমাদের কোনরূপ নমনীয়তা নেই। আমরা কখনোই এগুলো ছাড়ব না'।[৬০]

১৯৬৯ সালের ৩রা জুনে প্রকাশিত এক ভাষণে তৎকালীন ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডামেয়ার[৬১] (Golda Meir) বলেন, ১৯৬৭-এর পরে যুদ্ধ বিরতি সীমান্তের চাইতে উত্তম কোন সীমান্তের কল্পনাও আমরা করতে পারি না। আমরা অন্য কোন সীমান্ত চাই না'।

ইস্রাঈলী সেনাবাহিনীর কাছে প্রদত্ত অন্য এক ভাষণে, যা ১৯৬৯-এর ১০ই জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে, মিসেস গোল্ডামেয়ার বলেন, অন্যেরা সিদ্ধান্ত নেবে না আমাদের সীমানা কতদূর হবে। তোমরা যতদূর পৌঁছতে পারবে এবং দখল করতে পারবে, তা-ই আমাদের সীমানার একটি অংশে পরিণত হবে'।

একই বছর ২০শে অক্টোবরের এক ঘোষণায় তিনি বলেন, ১৯৬৭ সালের পূর্বের কোন সীমানার অস্তিত্ব এখন আর নেই। আমরা বর্তমান অধিকৃত সীমানা থেকে এক ইঞ্চি সরে আসব না, যতদিন না আরবদের সঙ্গে একটি মযবূত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

ইস্রাঈলী পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এ নতুন মন্ত্রীসভা কাজ শুরু করার সময় ১৯৬৯-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর গোল্ডামেয়ার বলেন, ইস্রাঈল তার বিজিত আরবভূমিতে

---

৬০. The American Newsweek Review-Interview of Levi, Ishkol, issue 11, 17.2.1969.

৬১. মিসেস গোল্ডামেয়ার (১৮৯৮-১৯৭৮ খৃ.) একজন ইস্রাঈলী শিক্ষিকা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি লেভি ইস্কলের পরে ইস্রাঈলের ৪র্থ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি পৃথিবীর ৪র্থ এবং ইস্রাঈলের ১ম প্রধানমন্ত্রী হন। ইতিপূর্বে তিনি ইস্রাঈলের শ্রম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন এবং 'লৌহ মানবী' (Iron Lady) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭৩-এর ৬-২৫শে অক্টোবর আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের পর ১৯৭৪ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। -অনুবাদক।

Contents

অবস্থান করবে, যতদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বহাল থাকবে। কোন আন্তর্জাতিক চাপ কিংবা আরব সন্ত্রাসবাদ ইস্রাঈলকে জোর করে '৬৭-এর (৫ হ'তে ১০ই জুন) ছয়দিনের যুদ্ধের (Six-Day War) পূর্বেকার সীমান্তে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না'।

১৯৬৮-এর ১৫ই জুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান[৬২] (Moshe Dayan) ঘোষণা করেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'পার্টিশন স্কীমে'র আওতায় আরোপিত সীমান্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের বংশধরেরা সেটা সংশোধন করেছে এবং ছয়দিনের যুদ্ধে সেটা বাড়িয়ে সুয়েজ, জর্ডান ও গোলান মালভূমিকে শামিল করে নিয়েছে। এটাই শেষ নয়। আমাদের নতুন যুদ্ধবিরতি সীমান্ত জর্ডানের সীমানা অতিক্রম করবে, এমনকি লেবানন ও মধ্য সিরিয়া পর্যন্ত'।

১৯৬৯-এর ২৭শে জুন তিনি আরও বলেন, গোলান মালভূমি কখনোই সিরিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আমরা অবশ্যই শেরম আল-শেইখ এবং আইলাট বন্দরমুখী প্রণালী আমাদের অধিকারে রাখব; একীভূত জেরুযালেম আর কখনোই বিভক্ত হবে না। তবে ইস্রাঈল ইগান এলোন পরিকল্পনা (Igan Allon Project) কাঠামোর অধীনে অধিকৃত পশ্চিম তীর জর্ডানের নিকট ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। যেখানে শর্ত রয়েছে যে, পশ্চিম তীরকে জর্ডানের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হ'লে সেটাকে অস্ত্রমুক্ত করা হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি ইস্রাঈলী কৌশলগত সৈন্য ছাউনি ছাড়া, যা জর্ডান নদী বরাবর বিস্তৃত থাকবে'।

---

৬২. মোশে দায়ান (১৯১৫-১৯৮১ খৃ.) ইস্রাঈলের একজন সামরিক নেতা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৩০ সালে লেবাননে রেইড করার সময় গুলিতে তার এক চোখ বিনষ্ট হয়। এসময় তিনি বেন গুরিয়নের নিকটবর্তী হন। ১৯৪৮ সালে আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের সময় তিনি জেরুযালেম ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন এবং ১৯৫৩-৫৮ সালে ইস্রাঈলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ ছিলেন। ১৯৫৯ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বেন গুরিয়নের নেতৃত্বাধীন মধ্য-বাম 'মাপাই' পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনি কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৫-তে মাপাই পার্টি ছেড়ে সাইমন পেরেস-এর সাথে মিলে 'রাফী' (Rafi) পার্টি গঠন করেন। ১৯৬৭-এর ছয়দিনের যুদ্ধের পূর্বে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। যুদ্ধে দুঃসাহসিক নেতৃত্বের জন্য তিনি ইস্রাঈলের 'যুদ্ধের প্রতীক' (Fighting Symbol) হিসাবে বরিত হন। লিকুদ পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী মেনাহিম বেগিনের সময় তিনি ১৯৭৭-৭৯ পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি মিসর-ইস্রাঈল শান্তি চুক্তির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। -অনুবাদক।

১৯৬৯ সালের ৩রা আগস্ট এক শ্রমিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মোশে দায়ান বলেন, জর্ডান নদী যাকে আমরা ইস্রাঈলের পূর্ব সীমানা বলে মনে করি, সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও গাযা এলাকা কখনোই ত্যাগ করা হবে না। আইলট বন্দরে ও এর দক্ষিণের নৌপথ অবশ্যই নিশ্চিত হ'তে হবে এবং আমাদের সেনাবাহিনী দ্বারা তাকে অবশ্যই নিরাপদ রাখতে হবে। যারা অবশ্যই প্রণালী এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে, যা ঈসরাঈলের আঞ্চলিক সীমানার একটি অংশ'।

২০শে আগস্ট তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, লেবার পার্টির বার্ষিক পরিকল্পনা আসলে ইস্রাঈল সরকারের বিবৃতি ও সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা। যার উদ্দেশ্য আরব সেনাবাহিনীকে জর্ডান নদীর সীমানায় পৌঁছা থেকে বিরত রাখা এবং গাযা, গোলান ও শেরম আল-শেইখ এলাকা যা একটি স্থল করিডোর দ্বারা ইস্রাঈলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এসবের উপরে স্থায়ীভাবে দখল কায়েম রাখা'।

১৫ই আগস্ট তিনি বলেন, আমাদেরকে নতুনভাবে ইস্রাঈলের মানচিত্র অংকন করতে হবে। যেখানে জেরুযালেম গাযা, শেরম আল-শেইখ ও গোলান এলাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আরবরা এই মানচিত্র প্রত্যাখান করে, তবে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব'।

১৯৬৯ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি ঘোষণা করেন, নতুন প্যালেস্টাইন অবশ্যই বিস্তৃত হবে উত্তরে গোলান মালভূমি, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর এবং শেরম আল-শেইখ পর্যন্ত। সিনাই এলাকার একটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, যা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। যাকে 'ইহূদী জিব্রাল্টার' (jewish Gibraltar) হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে'।

২২শে অক্টোবর তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন, একমাত্র সেই শান্তিচুক্তিতে ইস্রাঈল বিশ্বাস রাখতে পারে, যা একথা মেনে নেবে যে, সমস্ত ইস্রাঈলী সীমান্ত কেবলমাত্র ইস্রাঈলী সেনাবাহিনী দ্বারাই রক্ষা করা হবে।

২৩শে অক্টোবর জেরুযালেমের এক নির্বাচনী সভায় মোশে দায়ান ঘোষণা করেন যে, 'আমি শেরম আল-শেইখকে যুদ্ধাবস্থায় ইস্রাঈলী সেনাবাহিনীর

দখলে রাখাকে অধিকতর পসন্দ করি, শান্তি বহাল করে তাকে আরবদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে।

১৯৬৮ সালের ২৮শে মে মেনাহিম বেগিন ঘোষণা করেন যে, আরব ভূমিতে আমাদের এই বর্তমান অধিকার একটি আইনগত সার্বভৌমত্বের পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কেননা অধিকৃত আরবভূমি আসলে সেই ভূমি, যা অন্যের অবৈধ দখল থেকে ইস্রাঈল মুক্ত করেছে'।

১৯৬৭-এর যুদ্ধের পরপরই 'নেসেট'-এর এক আলোচনায় তিনি বলেন, আমি আমার এই অটল দাবী কখনোই পরিত্যাগ করব না যে, জর্ডান ও গাযার সমন্বয়ে ইস্রাঈলের যে ঐতিহাসিক সীমান্ত (নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস), তা-ই ইস্রাঈলের প্রকৃত সীমান্ত।[৬৩]

১৯৬৮-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ইস্রাঈলী হেরাট পার্টির (Hairout Party) কেন্দ্রীয় কমিটিতে বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেন, আমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় ভালভাবে সফলতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে অধিকৃত এলাকাসমূহে কলোনী স্থাপন অভিযান শুরু করা উচিত। অধিকৃত ভূমিতে বসতি স্থাপন কেবল যথার্থ নয়। বরং কর্তব্যও বটে। যার সম্পাদন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য অতীব যরূরী।

১৯৬৯-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইস্রাঈলী ভাইস প্রেসিডেন্ট আইগাল এলোন (Yigal Allon) এক ঘোষণায় বলেন, জেরুযালেম চিরদিন ইস্রাঈলের রাজধানী হিসাবে অবিভক্ত থাকবে'।

তেলআবিব থেকে প্রকাশিত ইস্রাঈলী সংবাদপত্র হারেজকে (Haaretz) দেওয়া ৬৯-এর ১২ই সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় তিনি বলেন, যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কৌশলগত সুবিধার জন্যই এটা আমাদের প্রয়োজন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ৬৭-এর যুদ্ধে ইস্রাঈল সিরিয়ার আরও অভ্যন্তরে 'জাবাল আল-দ্রুয' (Jabal al-Druze) পর্যন্ত এগিয়ে যায়নি।

---

৬৩. বেগিন মনে করতেন যে, ১৯৬৭-এর যুদ্ধে যেসব আরবভূমি ইস্রাঈলের দখলে এসেছে, এটি নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস ঐতিহাসিক সীমান্ত পর্যন্ত বৃহত্তর ইস্রাঈল প্রতিষ্ঠার বাস্তবতার প্রতি একটি পদক্ষেপ।

একই দিনে অপর এক ঘোষণায় তিনি বলেন, 'কেবল সামরিক উপস্থিতি যথেষ্ট নয়। বরং আমাদের অবশ্যই সারা বছর ধরে নাগরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে হবে'।

Fait accompli-এর ভিত্তিতে রচিত সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য ইস্রাঈল কোন প্রকার চুক্তির অপেক্ষা না করে তার অধিকৃত ভূমিতে সঠিক ছক অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পরে সমস্ত ইস্রাঈলী নেতা একসঙ্গে বা একের পর এক সর্বত্র একই ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইস্রাঈল কখনোই জেরুযালেম থেকে তার অধিকার প্রত্যাহার করবে না এবং শান্তি আলোচনায় কখনোই জেরুযালেমকে জড়াবে না। গোল্ডামেয়ার নিজে দম্ভভরে বলেন যে, জর্ডানী পতাকা আর কখনোই জেরুযালেমে উড়বে না'।

ইস্রাঈলীরা এ কথা কখনো অনুভব করে না যে, ১৯৬৭ সালে দখলীকৃত সিনাই, আল-আরিশ, গাযা, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও গোলান মালভূমি প্রভৃতি এলাকা তাদের অস্থায়ী দখলে রয়েছে। ইহূদীদের দাবী অনুযায়ী এসব এলাকার সঙ্গে ইহূদীদের সম্পর্ক একটি দেশ ও তার জনগণের মধ্যকার দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্কের ন্যায় এবং তাদের দাবী মতে যেহেতু তারা এককালে বহুদিন যাবৎ এসব এলাকায় বসবাস করত, সে কারণে এখানে তাদের দখল কায়েম করার অপ্রতিরোধ্য অধিকার রয়েছে। ইস্রাঈল এরূপ একটা সুযোগের জন্য বহুদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল।

ইহূদী প্রশ্নে ইহূদীবাদী আন্দোলনের সমাধান ছিল মূলতঃ কতগুলো ধারণা, বাস্তবতা ও ধর্মীয় অঙ্গীকার ও মতবাদের উপর ভিত্তিশীল। এভাবে বহু পূর্বে ১৯০৭ সালে ইস্রাঈলীদের সুসংগঠিতভাবে ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের সময় থেকেই ইহূদী আন্দোলনের লক্ষ্য একই আছে।

ইস্রাঈলের তৎকালীন শাসক পার্টি 'মাপাই' (Mapai) বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ১৯৫১ সালের নির্বাচনের সময় ২৩তম ইহূদী সম্মেলনের (Zionist Congress) প্রতিনিধিদের সম্মুখে। যখন পার্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয় নিম্নোক্তভাবে যে, ইহূদী আন্দোলনের কাজ একটাই

Contents

ছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে, সেটা হ'ল ইহূদী প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার ইহূদীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

প্রাক্তন ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী লেভী ইস্কল (Levy Ishkol) ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য লিখিত ইস্রাঈল সরকারের বার্ষিক রিপোর্ট বইয়ের ভূমিকায় লিখেন যে, আমরা যদি সত্যিকারের ইহূদীবাদী হই, তাহ'লে ইহূদী প্রত্যাগমনের ব্যাপারে আমাদের দাবী পরিত্যাগ করতে পারি না। বরং সকল ঘটনাতেই তাদেরকে এর নিশ্চয়তা দিতে হবে। বেন গুরিয়ন ১৯৬১ সালে এক বক্তৃতায় বলেন, প্রত্যেক ইহূদী যে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে আসতে অস্বীকার করবে, সে ইস্রাঈলের প্রভুর দয়া ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হবে'।

ইহূদী জনগণের জন্য ইহূদী আন্দোলনের মতবাদগত লক্ষ্যের সার সংক্ষেপ হ'তে পারে 'ইস্রাঈলের সীমানা নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত করা এবং এখানে পৃথিবীর সকল ইহূদীর বসতি স্থাপন করা'। যারা এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল ১৯৬৭-এর যুদ্ধ তাদের জন্য ছিল উত্তম জওয়াব।[৬৪]

৩. অর্থনৈতিক কারণ (The Economic factor p. 70) :

যারা ইস্রাঈলের ভৌগলিক অবস্থান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দেখেছেন এর কৃষির প্রয়োজনীয়তা ও ইহূদী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপক উদ্যোগ, তারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, এ সমস্যা সমাধানের জন্য মাত্র দু'টি বিকল্প রয়েছে।-

(ক) মূল বাসিন্দাদের উৎখাত করে উর্বর আরবভূমি দখলের মাধ্যমে ইস্রাঈলের সীমানা সরাসরি বিস্তৃত করা।

(খ) আরবের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে নাজাব এলাকার উন্নয়ন। যে পানির উৎস, স্রোত এমনকি তার মোহনা পর্যন্ত আরবভূমিতে অবস্থিত। ইস্রাঈল তার নাজাব এলাকা সেচ করার জন্য নদীর স্রোত বিভিন্ন দিকে বিভক্ত করেছে। যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯৬৪ সালের ১ম আরব শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ জর্ডান নদীর শাখা নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

৬৪. দ্রষ্টব্য : Israeli militarism' p. 58-63.

ইস্রাঈল তার অধিকৃত অঞ্চলে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ নিয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা বরাবর ইহূদী বসতি স্থাপন। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানসমূহে ইস্রাঈল ঘাঁটি গেড়েছে।

২. সমস্ত নগরী ও গ্রামসমূহ থেকে অধিবাসীদের উৎখাত করা এই খোঁড়া অজুহাতে যে, তারা প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ শক্তিসমূহকে সহযোগিতা করে।

অন্যান্য কৌশলের মধ্যে এটি একটি ব্যাপক দণ্ডযোগ্য কৌশল যা সে সম্প্রতি অবলম্বন করেছে তার সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য।

৩. যেলা সমূহের নতুন ইহূদী নামকরণ এবং সমস্ত আরব নিদর্শন মুছে ফেলার মাধ্যমে অধিকৃত আরব এলাকায় ইহূদীবাদের ছাপ দিতে চেষ্টা করা।

৪. অধিকৃত আরবভূমি থেকে বাসিন্দাদের বের করে দেওয়া এবং তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে সমস্ত অঞ্চলকে খালি করে ফেলা।

(গ) ইস্রাঈলের প্রতিরক্ষা। ইস্রাঈলের মূল ভূখণ্ড এবং ’৬৭-এর জুন যুদ্ধে অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য প্রবল প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি চমক লাগানো সেনাবাহিনী (Striking force) অবশ্য প্রয়োজন।[৬৫] সে কারণেই ইস্রাঈল তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করছে এবং যুদ্ধের জন্য তার জনগণকে বস্তুগত ও নৈতিক উভয় প্রকারেই প্রস্তুত করে তুলছে।

মোশে দায়ান সেনাবাহিনী প্রধান থাকাকালে ১৯৫৫ সালের ৫ই জানুয়ারী লিখিত ‘ইস্রাঈলের সীমানা ও নিরাপত্তা সমস্যা’ নামক এক নিবন্ধে বলেন, ইস্রাঈল অস্বাভাবিক রকমের জটিল এক নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেশের আয়তন ৮১০০ বর্গমাইলের বেশী হবে না। যখন তার সীমান্ত এলাকা ৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা হাইফা বন্দরের

---

৬৫. ইস্রাঈল ১৯৬৭-এর পর থেকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে তাদের সক্রিয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা ২৫ হাযার থেকে ৮০ হাযারে উন্নীত হয়। সেই সাথে তাদের সামরিক বাজেটও বৃদ্ধি পায়। American foreign affairs magazine, p. 250. Issue of January 1955.

উত্তর থেকে তেলআবিবের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমিতে বাস করে। ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান সীমান্তের মধ্যবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ এই সরু ফালিটির প্রস্থ ১২ মাইল অতিক্রম করবে না। জেরুযালেমের ইস্রাঈলী পার্লামেন্টের (নেসেট) মাত্র কয়েক শত মিটার দূরেই জর্ডানী সেনাবাহিনীকে দেখতে পাওয়া যায়।

উপকূলীয় সমতল ভূমিতে অবস্থিত ইস্রাঈলের মিলিটারী হেড কোয়ার্টারগুলি জর্ডানের সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলো থেকে খুব ভালভাবেই দেখা যায়। প্রধান সড়ক পথ ও রেলপথগুলো খুব সহজে ও দ্রুত হামলার জন্য উন্মুক্ত। তাই বলতে গেলে শত্রুর গোলার নাগালের বাইরে ইস্রাঈলের কোন স্থানই নেই নাজাব (Nagav desert) মরু এলাকা ব্যতীত।

ইস্রাঈলী তদন্ত ব্যুরো প্রধান হেইম হার্জগ (Chaim Herzog) মিলিটারী সেন্সরশীপের উপরে বক্তৃতা প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯৬১ সালের ৩০শে মে তেলআবিবে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে যোগদানরত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার (I.P.I.) প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন যে, আপনারা এখন ইস্রাঈলের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থায় উপনীত জর্ডানী সেনাবাহিনীর মধ্যম ধরনের বন্দুকের নাগালের মধ্যে বসে আছেন। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে হার্জলিয়ায় (Hertzlia) আপনারা সম্মেলন করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যা ছিল ঐ একই সেনাবাহিনীর ভূমিবন্দুকের (Field gun) নাগালের মধ্যে। আপনারা ইস্রাঈলী পার্লামেন্ট নেসেট (Kenesset) পরিদর্শন করবেন, সেটাও জর্ডানী সেনাবাহিনীর মর্টারের গোলার নাগালে। যেখানে লোকেরা ঐ সমস্ত সরকারী অফিস ভবনেই পিস্তলের গুলি দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে।[৬৬] এক্ষণে এই সমস্যার সমাধান কি?

ইস্রাঈলী হেরাট (Heirut) পার্টির[৬৭] এ্যাংলো-স্যাক্সন (Anglo Saxon) বিষয়ক কর্মকর্তা আইজাক লাইবারম্যান (Isaac Lieferman) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইস্রাঈলকে বিদ্যুৎগতিতে একটা ত্বরিৎ হামলা চালাতে হবে

৬৬. (T.C. Hurewitz): The role of the military and government in Israel.
৬৭. Terrorist-roots for the Israeli Heirut party, Bassam Abu Gazaleh, Beirut, 1966. P. 67-75.

এবং গাযা এলাকা সহ সীমান্তের সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিতে হবে। অতঃপর সমস্ত জর্ডানে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে।[৬৮]

১৯৫৬ সালে মিসরের উপর ত্রয়ী হামলার সময় বেন গুরিয়ন (Ben Gurion) ইস্রাঈলের নেসেটে উক্ত হামলার পক্ষে বলেন যে, এই হামলা ইস্রাঈলের নিরাপত্তাকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করবে, শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে এবং তার পূর্বপুরুষদের ভূমিকে অন্যায়ভাবে দখলকারীদের কবল থেকে মুক্ত করবে।

১৯৬৭ সালে লেভি ইস্কল (Levi Eshkol) বেন গুরিয়নের ন্যায় একই যুক্তি পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মোশে দায়ান ও তার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেন।

ইস্রাঈল তার দখলকৃত আরবভূমি স্বীয় অধিকারে রাখার জন্য বার বার সীমান্ত নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে থাকে। কিন্তু ইস্রাঈলীরা সীমান্ত নিরাপত্তা চায় কেন? গাযা সেক্টর, আল-আরিশ এবং সিনাই এলাকায় ইস্রাঈলের আগ্রাসী লক্ষ্য সবারই জানা কথা। শেরম আল-শেইখ এবং আক্বাবা উপসাগরের পশ্চিম তীর দখলের ফলে আক্বাবা উপসাগরের নৌপথ ও আইলট (Eilat) প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হ'ল। সুয়েজখালের পূর্বতীর দখলের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রেখাটি ইস্রাঈলের নৌ-চলাচলের জন্য নিরাপদ রইল। এই খাল ট্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিকভাবেই একটি দারুণ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। খালের দখলকৃত পূর্বতীরে যখনই আরবদের দ্বারা কোন হামলা আসবে এবং উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় হবে, তখন আরব বাহিনী খোলা ময়দানে বের হ'তে বাধ্য হবে, যা তাদেরকে ব্যাপক বিমান হামলার সম্মুখীন করবে।

বিমান শক্তির আধিপত্যসহ সিনাই দখল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (মিসর) বরাবর সীমান্তকে যেকোন সম্ভাব্য সামরিক বিপদ থেকে ইস্রাঈলকে রক্ষা

৬৮. A declaration published in the pamphlet 'The Arab palestinian refugee' The Arab palestinian refugees office, April 1956. পুনরুক্তির কারণে পরবর্তী প্যারাটির অনুবাদ বাদ দেওয়া হ'ল।-অনুবাদক।

করবে। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর দখলের ফলে পূর্বতীর সুনিশ্চিতভাবে পানির বাধার কারণে প্রাকৃতিক নিয়মেই নিরাপদে থাকবে।

সিরীয় উপত্যকায় অনেকগুলো পানির উৎস রয়েছে। অধিকন্তু এর একদিকে পূর্বাঞ্চলীয় ইস্রাঈলী কলোনী ও উত্তর দিকে সিরীয় ভূমি থাকার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। গোলানে (Golan Heights) সিরীয়-আরব বাহিনীর উপস্থিতি ইস্রাঈলের নিরাপত্তার জন্য একটি সরাসরি হুমকি। অতএব ইস্রাঈল তার উত্তর সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্য এই সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটির উপর এবং এই মালভূমি ও হারমন পর্বতের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এই এলাকাটিকে নিজ দখলে আনা অত্যন্ত যরূরী মনে করে। ওদিকে গোলানে ইস্রাঈলী বাহিনী পূর্বে ডেরা (Deraa) এবং পশ্চিমে দামেস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত সিরীয় ভূখণ্ডের জন্য হুমকি তৈরী করেছে।

সিরীয় মালভূমির একটি বিশেষ সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। যারা এই মালভূমি নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই লেবানন, সিরিয়া, ট্রান্স জর্ডান ও প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রণ করবে।

হযরত খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১৩ হিজরী সনের ঐতিহাসিক ইয়ারমূক যুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হয় এবং একথা সবাই জানেন যে, ইয়ারমূক ছিল একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং এই অঞ্চলের উপর মুসলিম শক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও প্যালেস্টাইন বিজয় অতি সহজেই সম্ভব হয়।

সে কারণেই ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পরে মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, ইস্রাঈলী সীমান্তসমূহের প্রতিরক্ষা পূর্বে যা ভাবা হ'ত, তার চেয়ে এখন অনেক বেশী সহজ (Much easier) হয়েছে।[৬৯]

১৯৬৯-এর ৫ই আগস্ট সমাপ্ত ইস্রাঈলের শাসক লেবার পার্টির সম্মেলনে একথা প্রকাশ করা হয় যে, ইস্রাঈল তার অধিকৃত এলাকা থেকে সরে আসবে

৬৯. এই ঘোষণা ১৯৬৭-এর জুলাই মাসের প্রথমার্ধে করা হয় এবং ঐ সময়কার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

না। এই পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা মোশে দায়ান ঘোষণা করেন যে, ইস্রাঈল তার অধিকৃত জেরুযালেম, গাযা, সিনাই, সিরীয় মালভূমি এবং পশ্চিম তীরে অবস্থান করতে চায়। ইস্রাঈল জর্ডান নদীকে তার নিরাপদ পূর্ব সীমানা বলে মনে করে।

৪. রাজনৈতিক কারণ (The political factor p.78) :

ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী পরিকল্পনার পিছনে যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে তার সঙ্গে বিশ্ব ইহূদী আন্দোলন একটি বিশেষ গুরুত্ব সংযোগ করেছে। আন্দোলন একথা উপলব্ধি করে যে, জুন যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজনৈতিক যোগসূত্রসমূহ একটি চূড়ান্ত সামরিক বিজয়ের পথ দেখাবে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে কি কি বিষয় ইস্রাঈলকে আরবদের উপর জয় লাভে সহায়তা করেছে এ ধরনের এক প্রশ্নের উত্তরে জনৈক দায়িত্বশীল ইস্রাঈলী নেতা পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনকে বলেন যে, নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় আরবদের উপর আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ১. রাজনৈতিক ২. গণ তথ্য ৩. বৈজ্ঞানিক ৪. নৈতিক ও ৫. সামরিক।[৭০]

এই দায়িত্বশীল নেতা উপরোল্লেখিত সকল বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এর সর্বাধিক গুরুত্বের কারণে এবং সিদ্ধান্ত কারী ফলশ্রুতির কারণে যা চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য পথ দেখাতে পারে।

আরব দেশসমূহের সঙ্গে ইস্রাঈলও জাতিসংঘের একটি সদস্য দেশ। জাতিসংঘের চুক্তিনামায় কয়েকটি নিবন্ধ সংযোজিত রয়েছে, যেখানে একটি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক অপর সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা চালানো কিংবা পরস্পরের ভূমি অন্যায়ভাবে দখলে রাখার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ইস্রাঈল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে একই সঙ্গে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও জর্ডান সহ মোট তিনটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী তৎপরতা চালায়। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কয়েকবার

৭০. The Decisive days, 149.

প্রস্তাব গ্রহণ করে। যাতে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেওয়া ও যুদ্ধের সময় অধিকৃত ভূমি থেকে ইস্রাঈলী প্রত্যাহার এবং জেরুযালেমকে কুক্ষিগত ও ইস্রাঈলী অধিকারে নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়। ইস্রাঈল প্রকাশ্যে জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে। কেউ বিস্মিত হ'তে পারে যে, ইস্রাঈল কিভাবে জাতিসংঘ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে? কিন্তু আসলে এসব তার আগ্রাসনের প্রতি বিশেষ দেশসমূহের প্রকাশ্য ও গোপন সমর্থন ও উৎসাহের ফলশ্রুতি নয় কি?

মনে করুন যদি আরবরা ইস্রাঈলের কোন একটি অংশ দখল করত, তা'হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কি চুপ করে থাকত? বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এই দখলের প্রতিবাদে কিছুই না করে পারত?

ইস্রাঈলের রাজনৈতিক তৎপরতার উদ্দেশ্যগুলো কি কি?

(ক) শান্তির বাহানা (Pretension of peace p.80) : ইস্রাঈল, যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ ও রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে এবং যা অস্তিত্ব লাভ করেছে ইহূদী আন্দোলনের ভিত্তিতে। সে আরব দেশসমূহে তার আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'ভায়োলেন্স' বা সহিংসতাকেই একমাত্র পথ হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

ইস্রাঈল শান্তি প্রস্তাব পেশ করার কোন একটি সুযোগকেই ছেড়ে দেয় না। এটা কেবল প্রোপাগাণ্ডা বৈ কিছুই নয়। এর দ্বারা সে বিশ্ব জনমতকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, সে আরবদের সঙ্গে শান্তি চায়। আরবদের মধ্যে যারা বহির্দেশ ভ্রমণ করেছেন, তারা প্রায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হন যে, 'আপনারা কেন ইহূদীদেরকে শান্তিতে বাস করতে দিচ্ছেন না? এইভাবে ইস্রাঈলী প্রোপাগাণ্ডা বহির্বিশ্বের জনমতকে ধোঁকা দিয়ে প্রকৃত অবস্থার বিপরীতে আগ্রাসনবাদী যালিমকে মযলূম এবং মযলূমকে যালিম হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

অধিকৃত আরবভূমিতে বহাল তবিয়তে অবস্থান করে ইস্রাঈল শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে। সে নিজের অস্তিত্বকে সমস্ত তর্কের ঊর্ধ্বে নিষ্পন্ন বিষয় (Fait accompli) বলে মনে করে। সে এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনায় জড়াতে চায় না। বরং সে মনে করে যে, পরিশেষে আরবরা ইস্রাঈলের আইনগত ও সাংবিধানিক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিবে।

ইস্রাঈলীরা প্যালেস্টাইনী আরব উদ্বাস্তুদেরকে জাতিসংঘের প্রস্তাবাবলী অনুযায়ী দেশে ফিরিয়ে আনতে অস্বীকার করেছে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘে উক্ত মর্মে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহূদী নেতারা এ ব্যাপারে বহুবার ঘোষণা দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক ফিলিস্তীনীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ১৯৫৭ সালে বেন গুরিয়নকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, 'ঘড়ির কাঁটা কেউ পিছনের দিকে ফিরাতে পারে না। ইস্রাঈল একজন আরব উদ্বাস্তুকেও গ্রহণ করবে না'। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর এবং বাস্তবসম্মত সম্ভাব্য সমাধান হ'ল, তাদেরকে সিরিয়া ও ইরাকের কোন অনাবাদী এলাকায় পুনর্বাসন করা, যা প্রাকৃতিকভাবেই সমৃদ্ধ।[৭১]

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সম্মুখে গোল্ডামেয়ার ১৯৬০ সালের নভেম্বরে ঘোষণা করেন, ইস্রাঈল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে যে, সে তার দেশে কোন উদ্বাস্তুকে ফিরে আসার অনুমতি দেবে না।[৭২]

বেন গুরিয়নের উত্তরাধিকারী লেভি ইস্কল, যাকে মনে করা হ'ত যে, তিনি আরবদের সঙ্গে শান্তি চান, তিনি মধ্যপন্থী এবং যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, তিনি ঘোষণা করেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যার একমাত্র সামাধান হ'ল তাদেরকে আরব দেশসমূহে পুনর্বাসন করা। এতে যেমন তাদের মৌলিক স্বার্থ রক্ষা পাবে, আমাদেরও তেমনি স্বার্থরক্ষা হবে'।[৭৩] তিনি আরও বলেন, আধুনিক যুগের ইতিহাসে কোন বড় ধরনের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান তাদেরকে তাদের আপন দেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে হয়নি।[৭৪] ইস্রাঈল আরবদের সঙ্গে তার সীমানা সম্পর্কিত যেকোন রূপ সংশোধনীকেও অস্বীকার করেছে। যদিও উক্ত মর্মে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তিনি যেকোন দায়িত্বশীল আরব নেতার সঙ্গে যেকোন স্থানে, যেকোন সময়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। লেভি ইস্কলের এ কথার উদ্ধৃতি পেশ করে ফ্রান্সের নামযাদা সংবাদ পত্র 'লা মণ্ডে' (Le Monde)-এর সংবাদদাতা বলেন, ইস্কল

৭১. The Jewish Bulletin of information. Vol. 13, No. 14, 8th of June, 1957.
৭২. The Jewish Bulletin of information, Vol. 16, No. 20, 28th November. 1960.
৭৩. Kissinger's memoirs, 1965-1966.
৭৪. Kissinger's memoirs, 1965-1966.

তাহ'লে অবশ্যই একথা পুরো নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি ইস্রাঈলী ভূখণ্ডের এক ইঞ্চি ভূমি ছাড়তে প্রস্তুত নন এবং তিনি একজন উদ্বাস্তুকেও কখনো ইস্রাঈলে ফিরতে দেবেন না।[৭৫]

ইস্রাঈল জেরুযালেম প্রশ্নে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে, তা দখলের উপরে জোর দেয়। ইস্রাঈল ১৯৬৭ সালের জুন মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে। বরং উল্টো সুয়েজ খালে জাহায চলাচলের পূর্ণ অধিকার দাবী করে বসে। সে এমনকি আরব অর্থনৈতিক বয়কট প্রত্যাহারেরও দাবী জানায় এবং ১৯৬৭-এর যুদ্ধ-পূর্ব কালের নিজ দেশের সীমানা বাড়াতে চায়।

ইস্রাঈল কি তাহ'লে সেই শান্তি চায় যা তার নিষ্পন্ন বিষয়ের (Fait accompli) ভিত্তিতে ও তার নিজস্ব হুকুমে রচিত শর্ত অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।[৭৬] নাকি অন্য কথায় বললে এই দাঁড়ায় যে, সে স্থায়ী শান্তির জন্য আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কিন্তু এজন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারে ইচ্ছুক নয়।[৭৭]

উক্ত প্রবণতা বর্তমানে (১৯৭০ সাল) ইস্রাঈলে খুব নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে। যখন লেভি ইস্কল ঘোষণা করেন যে, ইস্রাঈল কখনোই জেরুযালেম ও গোলান মালভূমি ছেড়ে দেবে না এবং জর্ডান নদী সব সময় ইস্রাঈলের নিরাপদ উত্তর সীমানা হিসাবে থাকবে।[৭৮]

লেভি ইস্কল বলেন যে, আমরা আমাদের বিজয়কে বিক্রয় করতে চাই না। এমনকি শান্তির জন্যও নয়। যে শান্তি আমাদেরকে পুনরায় যুদ্ধ বিরতি সীমানায় অথবা ৬৭-এর ৪ঠা জুনের সীমানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সে শান্তি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৯]

---

৭৫. Le Monde - Paris, 12th March 1960.
৭৬. Burns - Between the Arabs and Israelis. London 1965, P. 51.
৭৭. Harary Itar, Making the wolf vegetarian - The New look magazine vol. 6., Number 2, Feb.196...(মূল বইতে এরূপ লেখা আছে)। -অনুবাদক।
৭৮. Al-Ahram, Cairo, Issue 11.2.1969.
৭৯. Al-Akbar-el Youmiah, a Cairo paper, Issue of 21.2.1969.

আমরা বিস্মিত হই যে, শান্তির অর্থ সম্পর্কে ইস্রাঈলের এই ধারণা কিভাবে প্রকৃত শান্তির সঙ্গে যোগসূত্র গড়তে পারে? ইস্রাঈলের প্রকৃত মনোভাব এবং তার নেতাদের দেওয়া ঘোষণা সমূহের মাঝে আমরা কিভাবে মেলাতে পারি? যেখানে তারা দাবী করছেন যে, তারা কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই আরবদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত!

ইস্রাঈলের শান্তি প্রস্তাব সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ধোঁকাপূর্ণ। কেননা তারা প্রধান সমস্যাগুলো বিবেচনায় আনতে চায় না, যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা এবং যেগুলো অব্যাহত থাকলে কোন প্রকার শান্তিচুক্তিই সম্পন্ন হ'তে পারে না। এ বিষয়ে একটি প্রধান প্রশ্ন হ'ল ইস্রাঈলের অস্তিত্ব এবং এর ফলে উদ্ভূত জটিলতা ও সমস্যাবলী। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরে শান্তির এক আবেদন জানিয়ে আবা ইবান বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য পুনরায় যুদ্ধাবস্থায় ফিরে যাওয়া নয়। বরং আমরা চাই শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে। আমাদের ভবিষ্যৎ অবশ্যই হবে শান্তিময় ভবিষ্যৎ। যার ভিত্তি হবে মতৈক্য, সমঝোতা এবং যুদ্ধ ও সামরিক ভীতিমুক্ত অবস্থার উপর।[৮০]

আবা ইবান যখন এই ঘোষণা দিচ্ছেন, তখন ইস্রাঈলী বাহিনী মিসর সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল এবং ১৯৫৬ সালে মিসরের উপরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বে ইস্রাঈল তখন গাযা ও সিনাই সেক্টরে সর্বাত্মক হামলা শুরু করে দিয়েছিল। শান্তির এই আবেদন বিশ্ববাসীর মনোযোগকে ইস্রাঈলী আগ্রাসন থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নিঃসন্দেহে নেতাদের একটি ধোঁকা ও সত্য বিকৃতকরণের অপচেষ্টা বৈ কিছুই নয়।[৮১]

১৯৫৬ সালে মিসরের উপরের ত্রয়ী হামলা চালানোর প্রাক্কালে ইস্রাঈল যেভাবে শান্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল, ঠিক তেমনি ১৯৬৭ সালে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে করেছিল। যেমন ১৯৬৭ সালের ৩০শে মে (যুদ্ধ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে) তেলআবিবের সাংবাদিক সম্মেলনে আবা ইবান ঘোষণা করেছিলেন যে, ইস্রাঈল কখনো যুদ্ধ শুরু করবে না, যতক্ষণ না জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রচেষ্টায় ক্লান্ত না হয়।

---

৮০. Ebba Iban : The voice of Israel. New York 1957. P. 292.
৮১. Ibrahim el-Abd, Violence and Peace, Beirut 1967, PP. 67-71.

বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো যখন উপরোক্ত শান্তির ঘোষণা প্রচার করছিল। ওদিকে তখন ইস্রাঈল তার সেনাবাহিনীতে ব্যাপকভাবে লোক ভর্তি শুরু করেছে এবং ঘরে ও বাইরে অবস্থানরত অস্ত্রবহনের ক্ষমতা সম্পন্ন সকল ইস্রাঈলীকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার নির্দেশ জারী করেছে। ইস্রাঈল তার আগ্রাসী পরিকল্পনা চরিতার্থ করার জন্য আরবদের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৬৭-এর যুদ্ধের পরে ইস্রাঈল পুনরায় শান্তির ভান করে। কিন্তু জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে। যেখানে তাকে অধিকৃত আরবভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে বলা হয়েছে। উপরন্তু সে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং ড. ইয়ারিং-এর শান্তি প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

প্যালেস্টাইন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য আহূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠানেও সে বিরোধিতা করে এই মিথ্যা অজুহাতে যে, সে আরবদের সঙ্গে এ ব্যাপারে সরাসরি আলোচনায় বসতে চায়।

ইস্রাঈলের দায়িত্বশীল নেতাদের মাধ্যমেই শান্তি প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হয় এবং ইহূদী তথ্য মাধ্যমসমূহ ইস্রাঈলী আগ্রাসী নীলনকশাগুলো ঢেকে রাখার ব্যাপারে স্রেফ একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মাত্র। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইস্রাঈলের আগ্রাসী হামলা ও তার শান্তি প্রস্তাব পেশ করার সময়কালের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে।

শান্তি আলোচনার সুযোগে ইস্রাঈল একদিকে নতুন আগ্রাসনের প্রস্তুতি নেয়, অন্যদিকে শান্তির জন্য কঠিন আশাবাদ ব্যক্ত করে। অতঃপর সে তার আগ্রাসী সামরিক তৎপরতাকে এই বলে চালিয়ে দিতে চায় যে, এর পিছনে তার উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ইস্রাঈল প্রায়ই আগ্রাসন ও সন্ত্রাস এবং শান্তি র আবেদন ও তার প্রশংসা ও সমর্থন সবকিছুকে একাকার করে ফেলে।

ইস্রাঈল শান্তির নামে ধোঁকা দেওয়ার এক নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে। সে দাবী করে যে, সে সর্বদা সে কার্যধারাকেই সম্মুখে নিয়ে চলেছে যা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশেষ প্রবল চেষ্টার দিকে এগিয়ে নিয়ে

যাবে।[৮২] যাকে তারা মনে করে যে, তখনই হবে সত্যিকারের একটি মযবূত ও প্রতিরোধকারী শক্তি অর্জন।[৮৩] ইস্রাঈলের অবিরত দাবী হ'ল অস্ত্র চাই, অস্ত্র, যা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে ও তাকে রক্ষা করবে।[৮৪] অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী সমৃদ্ধ শক্তিধর ইস্রাঈল ব্যতীত শান্তি কখনোই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।[৮৫] এ কারণেই ইস্রাঈলের জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল আরবদের উপর সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখার সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।[৮৬] বিগত ১০ বৎসর যাবৎ যে আপেক্ষিক শান্তি মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজ করছে, তা কেবলমাত্র ইস্রাঈলের সামরিক প্রাধান্যেরই বাস্তব ফলশ্রুতি।[৮৭] এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, ইসরাইল শান্তির সময়ে যে যুদ্ধ করেছে তা ছিল (তাদের ভাষায়) শান্তি রক্ষা ও তাকে স্থিতিশীল করার জন্য।[৮৮]

আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সঠিক প্রমাণ করবার জন্য ইস্রাঈল দাবী করে যে, এসব ঘটনা এই এলাকায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে অপরিহার্য ছিল।[৮৯] ইস্রাঈল শান্তি প্রত্যাশার ভান করে। কিন্তু আসলে সে কখনোই শান্তি চায় না। এতদসত্ত্বেও সে তার রাজনৈতিক মাধ্যমগুলোর সহযোগিতায় বহু বিদেশী রাষ্ট্রকে ও সেই সঙ্গে একটি বৃহৎ জনসংখ্যাকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, সে শান্তিতে বিশ্বাসী এবং সে শান্তি কামনা করে। এখন এটা আরব কূটনীতির উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হ'ল, ইস্রাঈলী নেতাদের দেওয়া বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনার মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া।

---

৮২. ইস্রাঈলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেভি ইস্কল কর্তৃক ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে বিদেশী সংবাদদাতা ক্লাবে দেওয়া ভাষণ থেকে যা New Look Magazine-এ প্রকাশিত হয়। Tel-Aviv. Vol. 7 No. 6, p. 8.

৮৩. The New Look Magazine, Tel-Aviv, July 1964, p. 58.

৮৪. The Jewish Information bulletin, New York, Vol. 10, No, 8 April 2, 1954.

৮৫. New York Herald Tribune, 20th December, 1965.

৮৬. The Eastern Israeli Society : Middle East Record, Vol. 1. London 1960. P. 175.

৮৭. ১৯৬৬ সালের ২৪শে মে তারিখে ইস্রাঈলী ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে প্রচারিত লেভি ইস্কলের ঘোষণা।

৮৮. Burns – p. 63.

৮৯. জর্ডানের পানি সিরিয়ায় ব্যবহারের জন্য নির্মিতব্য প্রজেক্টের (Work site) উপর ইস্রাঈলী হামলা উপলক্ষে জেরুযালেম পোস্ট-এ প্রকাশিত আবা ইবানের ঘোষণা।

(খ) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহানুভূতি আকর্ষণ (Gaining the sympathy of foreign countries p. 89) :

আরবদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাস করে যে, ইস্রাঈল যদি শান্তিতে বিশ্বাসী না হয়, তাহ'লে জাতিসংঘ তাকে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং শান্তি প্রস্তাব গ্রহণে তার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইস্রাঈল একমাত্র দেশ যার অন্তর্ভুক্তি নির্ভর করছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব প্রতিপালনের উপর। নিম্নের বিবৃতিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৯ সালের ১১ই মে তারিখে গৃহীত প্রস্তাব নং ৩৭৩/৩ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নিম্নোক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে ইস্রাঈলকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণে সম্মত হল : (১) কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই ইস্রাঈল জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবে এবং সদস্য হবার পরদিন থেকেই সে উক্ত সনদ অনুযায়ী কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে চেয়েছে (২) বিশেষ করে সে ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বরে এবং ১৯৪৮ সালের ১১ই জানুয়ারীতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য জাতিসংঘের নিয়োজিত বিশেষ রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে ইস্রাঈলী প্রতিনিধি পূর্ণ বিবরণ ও ব্যাখ্যাসহ ইতিমধ্যেই নোটিশ প্রদান করেছে'।[৯০]

প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে জাতিসংঘ সনদ মেনে চলার চুক্তিতে সম্মত হওয়া ইস্রাঈলের একটা কূটকৌশল বৈ কিছু নয়। জাতিসংঘে প্রবেশ লাভে যাতে তার বাধা দূর হয়। ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এটাই ছিল তার রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির প্রথম উদাহরণ। প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এইভাবে সে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও স্ববিরোধী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ এবং উপরোক্ত শর্তসমূহ পালনে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার মাত্র দু'মাস পরেই ইস্রাঈলী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জাতিসংঘের 'পুনর্মিলন

৯০. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব নং ৩০৩ (৩), ১১ই মে, ১৯৪৯। মূল বইয়ে এই সাথে ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর গৃহীত প্রস্তাবের কথাও বলা হয়েছে।

কমিটি'র অন্তর্গত 'বিশেষ কমিটি'র নিকট ১৯৪৯ সালের ২৮শে জুলাই পেশকৃত এক সরকারী স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, 'ঘড়ির কাঁটা পিছনে ফিরে যায় না। এটা যেমন অসম্ভব, কোন আরব উদ্বাস্তুর পক্ষে তাদের ফেলে যাওয়া পুরাতন আবাসভূমিতে ফিরে আসা তেমনি অসম্ভব'।[৯১]

সদস্যপদ লাভের সাত মাস পর ১৯৪৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর ইস্রাঈলী নেসেটে বেন গুরিয়ন ঘোষণা করেন যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৯ সালের ২৯শে নভেম্বর গৃহীত বিভক্তিকরণ প্রস্তাবকে ইস্রাঈল বাতিল, অবাস্তব ও বেআইনী মনে করে'।

এইভাবে ইস্রাঈল জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ বার বার অগ্রাহ্য করেছে এবং তা পালন করতে অস্বীকার করেছে। এমনকি সেই বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে সরাসরি এই সমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে যেখানে দাঁড়িয়ে সে একদা ঐ প্রস্তাবসমূহ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। সে প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা এবং ফিলিস্তীন উদ্বাস্তুদেরকে তাদের স্বদেশভূমিতে ফিরে আসার অধিকার অনুমোদন করা হয়েছে।

অথচ এরপরেও জাতিসংঘ প্রতিটি বৈঠকে উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়তা ব্যক্ত করে আসছে। সম্ভবতঃ পবিত্র ভূমিতে (জেরুযালেম) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের প্রধানের দেওয়া রিপোর্ট সহ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের রেকর্ডসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে যে, সে কখনোই যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি এবং সে সর্বদা এগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছে যাতে তার স্বার্থ রক্ষা পায় ও তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।[৯২]

ইস্রাঈল সেই সমস্ত এলাকায় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করেছে, যেসব এলাকা থেকে সে তার আক্রমণ তৎপরতা চালিয়ে থাকে।[৯৩]

---

৯১. The general assembly of the United Nations Document, No. 1367 annex No. 4, Chapter 3, section (H), 1st. paragraph.

৯২. Von-Horn-general Kari : A military peace mission, London 1966, p. 79.

৯৩. Burns, p. 55.

Contents

তারা তাদেরকে নির্জন এলাকাসমূহে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে বাধা দিয়েছে[৯৪] এবং বাধা দিয়েছে অধিকৃত আরব ভূমিতে যেতে।[৯৫] ইস্রাঈল প্যালেস্টাইনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে। তাদের ফাইলসমূহ সেন্সর করেছে। এমনকি তারযোগে প্রেরিত তাদের গোপন সংবাদ সমূহের পিছনেও চরম বেআইনীভাবে আড়ি পেতেছে।[৯৬] এসব দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইস্রাঈল ঐ সমস্ত জনশূন্য (No man's land) এলাকা ও সীমান্তের ভূমি থেকে হাযার হাযার আরব অধিবাসীকে বিতাড়িত করে অন্যায়ভাবে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করেছে এবং বিরাট এলাকা দখল করে নিয়েছে।[৯৭] ইস্রাঈল এসব জায়গায় তার আইনগত অধিকার দাবী করছে এবং সিরিয়া-ইস্রাঈল যুদ্ধ বিরতি কমিশনের বৈঠকসমূহ বয়কট করেছে। কেননা উক্ত কমিশন ঐ সমস্ত এলাকায় ইস্রাঈলী অধিকার অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছে।[৯৮] অধিকন্তু ইস্রাঈল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ধারাসমূহ লঙ্ঘন করে উক্ত জনশূন্য এলাকাসমূহে কৃষি বসতির নাম করে সৈন্যদের জন্য দুর্গসমূহ গড়ে তুলছে এবং এসব দুর্গ আরবদের বিরুদ্ধে হামলার কাজে ব্যবহার করছে।

---

৯৪. Hutchinson, The violent armistice : A military observer's look on the Arab-Israeli struggle.

৯৫. Burns, p. 55.

৯৬. General von Horn described Israeli espionage operations in his book; Military mission for peace in the eighth and Nineth chapter of the book.

৯৭. নিম্নোক্ত দলিল ও বইসমূহে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে :

(ক) General assembly document No. 1873, paper 55, para 514.
(খ) Security council document No. 3596, appendix 8.
(গ) ,, ,, ,, No. 2067, para 44.
(ঘ) ,, ,, ,, No. 3759, part 3 of appendix, 22–23.
(ঙ) ,, ,, ,, No. 2659, para 1 of second part of appendix.
(চ) ,, ,, ,, No. 25, 1950.
(ছ) ,, ,, ,, No. 2157.
(জ) General Benikey's report to the security council of 9th Nov. 1952.
(ঝ) General Hutchinson, The violent armistice, p. 20-28.

৯৮. Jerusalem post newspaper, issue of 29th Dec., 1967. Statement made by Ebba Iban.

আরব সীমান্ত এলাকাসমূহে ইস্রাঈলীদের অবিরত হামলা, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ও ইস্রাঈলের কৃত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সমূহের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। ইস্রাঈলী আগ্রাসন, বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ কমিশন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধের পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ বহু প্রস্তাব পাস করেছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল যে, ইস্রাঈল অধিকৃত সকল আরবভূমি থেকে সরে আসবে, পবিত্র নগরী জেরুযালেমকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে এবং ১৯৬৮ সালের মে মাসে জেরুযালেম নগরীতে সামরিক কুচকাওয়াজ করা হ'তে বিরত থাকবে। কিন্তু ইস্রাঈল এসব প্রস্তাবের কোনটাই মানেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা ইস্রাঈলকে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে সমর্থন দিয়ে এসেছে, তার স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং তার নীতিকে অনুসরণ করেছে।

ইস্রাঈলের স্বার্থের প্রতি মার্কিন সমর্থনের নযীর অসংখ্য। তার মধ্যে একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

২৮শে এপ্রিল তারিখে নেওয়া নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত প্রস্তাব লংঘন করে জেরুযালেমের আরব অংশের উপর দিয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ চালানোর জন্য ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৮ সালে ২রা মে তারিখের এক বৈঠকে কৃতসংকল্প হয়। কিন্তু আমেরিকা তাতে ভেটো দিয়ে নস্যাৎ করে দেয়।

ইস্রাঈল মধ্যপ্রাচ্যে পুরাতন ও নতুন উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান ঘাঁটি। যা উপনিবেশিক শক্তিগুলোকে শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে তাদের লক্ষ্য হাছিলে সহায়তা করে থাকে। আর এ কারণেই উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদ ও তার নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে এবং আমেরিকা অবিরত রাজনৈতিক সমর্থন ও সামরিক সাজসরঞ্জাম ও গোলাবারুদ দিয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি নিঃসন্দেহে সেখানে অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশসমূহের আর একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা আমেরিকার পথেই কাজ করছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হাছিলের অনুকূলে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সুতরাং উপরের আলোচনার সার সংক্ষেপ এভাবে টানা যেতে পারে-

প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অধিকৃত আরবভূমি থেকে ইস্রাঈলকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে এবং ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তুদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে ইস্রাঈলকে বাধ্য করতে সক্ষম নয়।

আরবদের পক্ষে সকল শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রচেষ্টা পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরব সামরিক শক্তিই কেবল পারে ইস্রাঈলী আগ্রাসনবাদী সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার চির সমাপ্তি ঘটাতে এবং পারে পবিত্র ভূমিতে আরব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

দ্বিতীয়তঃ একথা সুনিশ্চিত যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরশীলতা আরবদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা ইস্রাঈল তার পুরাতন ও নতুন উপনিবেশিক শক্তিসমূহ ও তাদের দোসরদের মদদ পাচ্ছে। অতএব আরবদেরকে পুরোপুরি তাদের নিজস্ব সামরিক শক্তির উপরেই নির্ভর করতে হবে।

তৃতীয়তঃ শক্তিশালী বা শক্তি দ্বারা মদদপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোকেই মাত্র অন্যান্য রাষ্ট্র সহানুভূতি দেখিয়ে থাকে। দুর্বলের প্রতি কেউই সহানুভূতি দেখায় না। স্বার্থই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমূহের মূল চালিকাশক্তি। এখানে কোনরূপ আবেগের স্থান নেই।

(গ) একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আরবদেরকে বাধ্য করা (Compelling the Arabs to conclude a peace agreement p. 96) :

ইস্রাঈল একথা ভালভাবে উপলব্ধি করে যে, ১৯৪৮ সালে তার জন্ম লাভের পর থেকে এতদঞ্চলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার সমাপ্তির জন্য তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপকারী হবে শক্তির জোরে আরবদেরকে অবশেষে একটি শান্তি চুক্তিতে বাধ্য করা। ইস্রাঈল তার চারিদিকে দুশমন প্রতিবেশীর মাঝে চিরকালের জন্য টিকে থাকতে পারে না। সব প্রতিবেশী তাকে বয়কট করেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এবং তার অস্তিত্বের প্রতি সর্বদা হুমকি হয়ে রয়েছে। অবিরত যুদ্ধের ফলে অপরিমেয় আর্থিক ও লোক ক্ষয়ের কারণে ইস্রাঈলে বর্তমানে যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাকে সে চিরকাল এড়িয়ে চলতে পারে না।

ইস্রাঈল জানে যে, যুদ্ধ যতকাল ধরে চলুক না কেন এবং তার জন্য যত রকমের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন হোক না কেন, চূড়ান্ত বিজয় অবশেষে আরবদেরই হবে। সামরিক ও কৌশলগত বিবেচনা সমূহ ইঙ্গিত বহন করে যে, পরিস্থিতি আরবদের পক্ষে এবং চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই।

প্রাজ্ঞ ইহূদী নেতাগণ উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ এবং সেজন্যই তারা ইহূদী জনগণকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রেখেছে যাতে এক জায়গায় জড়ো হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার মত পরিস্থিতি এড়ানো যায়। আরবরা হয়তো কিছুদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু চিরকালের জন্য তারা ঘুমিয়ে থাকবে না। যদি আরবরা কাজের সঠিক দিকনির্দেশ পায় এবং তা অনুসরণ করে তাহ'লে শীঘ্র হোক আর দেরীতে হোক, তারা ইস্রাঈলীদের ধ্বংস করবেই।

ইস্রাঈলী নেতারা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালে ইস্রাঈলের জন্মের ফলে সৃষ্ট বাস্তবতার নিকট আরবরা মাথা নত করবে এবং তার অস্তিত্বকে মেনে নিবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ তার উল্টা প্রমাণ বহন করে। ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে আরবদের ও মুসলমানদের পবিত্র আক্রোশ (Holy grudge) দিন দিন গভীর ও ভয়ংকর হচ্ছে। আরব নেতারা জানেন যে, ইস্রাঈলকে স্বীকৃতি দেওয়া বা তার সঙ্গে কোনরূপ শান্তিচুক্তি করা একেবারেই অসম্ভব। কেননা এর ফলে আরবদের মধ্যে ও মুসলিম জাহানে তাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে। এমনকি জীবনটাও হারাতে হবে (যেমনভাবে মিসরের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সা'আদাতকে হারাতে হয়েছে-অনুবাদক)। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, আরবরা কখনোই স্বেচ্ছায় ইস্রাঈলকে স্বীকার করে নেবে না।

আরবদেরকে শান্তি চুক্তিতে এবং ইস্রাঈলের অস্বিত্বকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করার জন্য ইস্রাঈল হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য সে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আরব দেশসমূহের উপর কয়েকবার হামলা চালায়। কিন্তু এসব আক্রমণ আরবদের পূর্ব সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে বরং সহায়ক হয়েছে এবং তাদের অসন্তোষ ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

অতঃপর ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহায়তায় ইস্রাঈল সুয়েজ খালের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করল এই অজুহাত দেখিয়ে যে, এর দ্বারা ইস্রাঈল ও

আরবদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। ইস্রাঈল তখন দাবী করেছিল যে, আরবদের হামলার অগ্রগতি রোধ করার জন্য সে আগেভাগেই একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল মাত্র।

ইস্রাঈলের সুয়েজ অভিযানের ফলে সে তার উদ্দেশ্যসমূহ হাছিলে ব্যর্থ হ'ল। অপরপক্ষে এর ফলে আরবদের মধ্যে এটি একটি কাঁটার মতো বিদ্ধ হ'ল। যা ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ বহুগুণ এগিয়ে দিল।

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ইস্রাঈল আরবদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে। অতঃপর '৬৭ সালে যখন সে আরবদেরকে পরাজিত করল তখন ভেবেছিল যে, আরবরা এবার তার দেওয়া শর্ত মত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হবে, যাতে সে আরবদের একটি বিরাট এলাকা দখলে রাখতে পারে। যাতে তার বিরুদ্ধে আরব অর্থনৈতিক অবরোধ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুয়েজ খালকে সে নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

আরবরা উক্ত ব্যাপারে ইস্রাঈলকে নিরাশ করেছে। বরং তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যে তারা সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছে। জয় না হওয়া পর্যন্ত যে যুদ্ধের শেষ নেই।

সামরিক শক্তি রাজনৈতিক শক্তির একটি অংশ বিশেষ। যখন দেশের কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন দেশের একমাত্র অবলম্বন হয় সামরিক শক্তি। ইস্রাঈল এই নীতিই অনুসরণ করে থাকে। সে আরবদের উপরে তার দেওয়া শর্ত মোতাবেক জোর করে শান্তি চুক্তি চাপিয়ে দিতে চায়। ইস্রাঈল কি তাহ'লে যথার্থ অর্থেই শান্তি চায়?

আমি এতে আদৌ সন্দেহ করি না যে, ইস্রাঈল ঐ শান্তিতে বিশ্বাসী নয়, যতক্ষণ না সে শান্তি তার স্বার্থ বাস্তবায়নে পুরাপুরি সক্ষম হবে। সে স্থায়ী শান্তির বদলে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি কামনা করে। যাতে এই অবসরে সে পুনরায় আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদী থাবা বিস্তারের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

তার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বের সমস্ত ইহূদীকে একটি বৃহত্তর ইস্রাঈলে সমবেত করা। যা নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস (ফোরাত) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর বাইরে তাদের যত কথা, সবই প্রতারণা মাত্র।

১৯৫০ সালের ৭ই এপ্রিলের এক বক্তৃতায় মেনাহিম বেগিন ঘোষণা করেন যে, একটি শান্তি চুক্তি নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ইস্রাঈলী জনগণ বা ইস্রাঈলের জন্য এমনকি আরবদের জন্যও কোনরূপ শান্তি আসতে পারে না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্বদেশ ভূমিকে পুরোপুরি স্বাধীন করতে পারব।[৯৯]

(ঘ) অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে ইস্রাঈলের রাজনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত করা (Elevating Israel's political status among other countries p. 100) :

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে নিজের দেশের মর্যাদা নির্ণীত হওয়ার প্রধান বিষয় হ'ল শক্তি। শক্তিমানরা সর্বদা উচ্চস্থান দখল করে থাকে। তখন দুর্বলেরা স্বভাবতই পিছনে পড়ে যায়।

জাতীয়তাবাদী চীনের বর্তমান অবস্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যখন জাপানীরা এর একটি বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্য হারানোর পর বৃটেনের বর্তমান অবস্থান পূর্বেকার অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যখন বলা হ'ত যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। বৃটেনের ক্ষেত্রে আজ যা সত্য, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর ক্ষেত্রেও তাই-ই সত্য।

যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা ছিল বিরাট। কোন রাষ্ট্রের ভাগ্য তখন হিটলারের টেলিফোনেই নির্ধারিত হ'ত। উদাহরণ স্বরূপ অস্ট্রিয়া দখলের সময়কার কথা ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী সকল রাজনীতিকদের নিকট ছিল গর্বের বস্তু। কিন্তু যখন যুদ্ধে হেরে গেল, তখন সে তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে একটা সাধারণ কলোনীতে পরিণত হ'ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার রাশিয়া ও জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পরবর্তীকালের রাশিয়া কখনোই এক নয়। বর্তমানে সে বিশ্বের দু'টি বৃহত্তম শক্তির অন্যতম। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যা সত্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই-ই সত্য। এমনিভাবে একটি বিপুলায়তন রাষ্ট্রের অবস্থা একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের অবস্থা থেকে ভিন্নতর। সে কারণেই ইস্রাঈল আরব বিশ্বে তার সম্প্রসারণবাদকে বিশ্বের ও ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে।

---

৯৯. Israel an Economic and Military danger, Beirut. P. 31.

উপসংহার (Epilogue p. 103)

জিহাদের বাস্তব আবেদন (The practical application of jihad p.105) :

॥ ১ ॥

১৩৮৯ হিজরীর ৮ই জুমাদাল আখিরাহ, মুতাবিক ২১শে আগস্ট ১৯৬৯, বৃহস্পতিবার ইস্রাঈল পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে, যাতে প্রাচীন মিম্বর সহ (Antique pulpit) মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বিধ্বস্ত হয়। এই অমানবিক হামলা মুসলমান এবং আরবরা যে মসজিদকে অতি পবিত্র মনে করে, তার প্রতি ইস্রাঈলের ঘৃণ্য ও পবিত্রতা নাশের একটি চরম দৃষ্টান্ত।

এটি অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যে, আল-আক্বছা মসজিদের এই অগ্নি সংযোগকে কেউই বিস্ময়ের ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ করেনি। যেহেতু বিশ্ব ইহূদী সম্প্রদায়, এমনকি তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই এই আশা পোষণ করে আসছে যে, তারা আল-আক্বছা মসজিদকে পুরা ধ্বংস করে দিয়ে সেই স্থলে সলেমানের মন্দির স্থাপন করবে। তাদের এই ইচ্ছা ও আকাঙ্খার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।-

(ক) ১৯৪৮-এ ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে (Before the birth of Israel in 1948 p. 106) :

ইহূদী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে যে, ইহূদীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে জেরুযালেম অতিক্রম করার জন্য। আরবদের জয় করবার জন্য এবং তাদের ফেলে আসা মন্দিরে পুনরায় উপাসনা শুরু ও সেখানে তাদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য।[১০০] বৃটানিকা বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, ইহূদীরা ভবিষ্যতে ইস্রাঈলের বিস্তৃতি, ইহূদী রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সলেমান মন্দিরের পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে।[১০১]

প্যালেস্টাইন বৃটিশ অধিকারে থাকাকালে ইহূদীরা তাদের আইনগত সম্পত্তি (Legal property) হিসাবে জেরুযালেমের পবিত্র মসজিদের উপর অধিকার

---

১০০. Hebrew Encyclopaedia, London 1904.

১০১. Britanica, London 1960.

দাবী করেছিল। ১৯২৯ সালে ইহূদী নেতা ক্লোজ (Kloztz) ঘোষণা করেন যে, আল-আক্বছা মসজিদ, যা সমস্ত পবিত্র স্থানসমূহের মধ্যে সেরা পবিত্র (Holy of the holies) হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি ইহূদীদের সম্পত্তি।

ইহূদী বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড মিচিট (Lord Mitchit) বলেন, সলেমান মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই শুভ দিন খুবই নিকটে এবং আমি আমার বাকী জীবন উৎসর্গ করব উক্ত মন্দির সেই স্থানে নির্মাণ করার জন্য, যেখানে আল-আক্বছা মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে।

(খ) ইস্রাঈলের জন্মের পর (After the birth of Israel p. 107) : ইস্রাঈলের জন্ম লাভের পর আল-আক্বছা মসজিদকে ধ্বংস করা ও সেই স্থলে সলেমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইস্রাঈলী পরিকল্পনা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৬৭ সালের ৬ই জুন ইস্রাঈল জেরুযালেমের প্রাচীন নগরী অধিকার করে। নগরী অধিকারের পরপরই প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে ইস্রাঈলী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বিলাপরত প্রাচীরের (Wailing wall) দিকে মার্চ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, 'মদীনার রাস্তা এখন আমাদের জন্য খোলা' (The road to El-Medina is now open)।[১০২]

একই দিনে তারা মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝখানে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নাচ-গানের মাধ্যমে এর পবিত্রতা বিনষ্ট করে *(ইন্নালিল্লাহ...)*।

১৯৬৭ সালেই ইস্রাঈল আল-আক্বছা মসজিদ সংলগ্ন প্রাচীন বিল্ডিংগুলো ভাঙতে শুরু করে এবং হিব্রু ধ্বংসাবশেষ সন্ধানে এর দেওয়াল সমূহের অভ্যন্তরে গর্ত খুঁড়তে থাকে। যাতে তারা সলেমান মন্দিরের নিদর্শন আবিষ্কারে সমর্থ হয়।

জেরুযালেম অধিকার উপলক্ষে আয়োজিত এক ধর্মীয় সম্মেলনে ইস্রাঈলী ধর্মমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদের ভূমি নতুন দখলের অধিকার বলে এবং দু'হাযার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক ক্রয় করার অধিকার বলে আইনত ইহূদী সম্পত্তি।

---

১০২. El-Medina E-Monawarah of Saudi Arabia.

সলেমান মন্দিরের পুনর্নির্মাণের জন্য ইস্রাঈল সারা বিশ্বের ইহূদী ও ইহূদীদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

জেরুযালেমের মুসলিম বিষয়ক সুপ্রীম কাউন্সিলের নিকট ১৯৬৮ সালের ৩০শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লিখিত এক চিঠিতে জনৈক আমেরিকান বলেন, সলেমানের মন্দির আসলে ফ্রী ম্যাসনদের[১০৩] কুটির (Masonic lodge) ছিল এবং সলেমান ছিলেন সেই কুটিরের গৃহকর্তা। হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত আল-আক্বছা মসজিদ উক্ত স্থানে এবং শিলাখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যার উপরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহ্র নামে কুরবানী দিয়েছিলেন। সলেমান মন্দিরের পুনর্নির্মিত রূপ দেখতে চাই বিধায় একজন ফ্রী ম্যাসন সদস্য এবং এর একটি গ্রুপের নেতা হিসাবে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী এর নির্মাণ ব্যয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হ'ল একশত মিলিয়ন ডলার চাঁদা সংগ্রহ করা।[১০৪]

বেন গুরিয়ন প্রায়ই বলে থাকেন, জেরুযালেম ছাড়া ইস্রাঈলের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি সলেমান মন্দির ছাড়া জেরুযালেমের কোন অর্থ হয় না।

আল-আক্বছা মসজিদে আগুন লাগাবার একমাস পূর্ব থেকেই ইস্রাঈলী সংবাদ-পত্রগুলো এ ব্যাপারে পরিবেশ তৈরী করে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত উদ্দেশ্য হাছিলে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়।

উদাহরণ স্বরূপ 'লা মেরহাব' (La-Merhab) নামক একটি ইহূদী পত্রিকা 'জেরুযালেমের সলেমান মন্দির' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয় যে, 'ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষকে যেকোন মূল্যে (জেরুযালেম সহ) মুসলমানদের সকল পবিত্র স্থান দখল করতে হবে এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে'।

১০৩. ফ্রী ম্যাসন সারাবিশ্বে কার্যরত ইহূদীদের একটি গুপ্ত সংগঠনের নাম-অনুবাদক।
১০৪. চিঠিটির পূর্ণ বিবরণ Islamic Awakening, Kuwait No. 49. Issue 29th march. 1969 দেখুন।

আল-আক্বছা মসজিদে আগুন লাগানোর পর ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষ ১৯৬৯-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হেবরন শহরে অবস্থিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মসজিদ দখল করে এবং আরবদের ও মুসলমানদের সকল প্রতিবাদ ও ঘৃণা সত্ত্বেও একে ইহূদী পূজা মন্দিরে (Synagogue) রূপান্তরিত করে। সাথে সাথে মুসলমানদের উপর এখানে ইবাদত করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিঃসন্দেহে ইহূদীরা ইব্রাহীমী মসজিদের উপর চিরস্থায়ী দখল কায়েমের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সেখানে তথ্যানুসন্ধানমূলক পদক্ষেপ (Exploratory step) গ্রহণ করেছে মাত্র'।[১০৫]

১৯৭০ সালের ২২শে জুলাই পাদ্রী লিভিঞ্জারকে হেবরনের সামরিক গভর্নর-এর বাড়ী থেকে বের হ'তে দেখা গেল। তাকে একজন পাদ্রীর চাইতে বরং একজন আমেরিকান রাখাল বালক বলেই মনে হচ্ছিল।

কোমরে চামড়ার বেল্টে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক ঝুলানো এবং ডোরাকাটা স্পোর্টস জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় তিনি ছিলেন। তার সঙ্গে প্রসিদ্ধ বৃটিশ পত্রিকা 'দি গার্ডিয়ানের' সংবাদদাতা ছিলেন। দু'জনে হেবরনের একটি পাহাড়ের উপর দিয়ে চলছিলেন, যেখানে আরব মেয়রের বাসস্থান ছিল। এমন সময় পাদ্রী লিভিঞ্জার বললেন, 'আমরা এখানে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে আমাদের বসত-বাড়ী গড়ে তুলব। আমরা প্রথমতঃ এখানে আড়াইশ' ইহূদী পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করব এবং শেষ পর্যন্ত আড়াই হাযার বাসিন্দার বসবাসের সুযোগ করে দেব'।

সংবাদদাতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন (স্থানীয়) আরবদের ব্যবস্থা কি হবে'? পাদ্রী উত্তর দিলেন, 'আমরা আরবদের পরাজিত করব এবং বৃহত্তর হেবরনের গোড়া পত্তন করব'।

হেবরন ইস্রাঈলের একটি অংশ, যা তেল-আবিবের চাইতেও আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে একজন সম্পদশালী ইহূদী তার বেতের ফ্যাক্টরী সুচারুরূপে পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এখানে এসেছে।

---

১০৫. ১৯৭০ সালের ২০শে জুলাই আম্মান থেকে খবর এসেছে যে, ইস্রাঈলী কর্তৃপক্ষ বাস্তবে ইব্রাহীমী মসজিদের রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তারা এর ভিতরে তাদের কিছু ধর্মীয় প্রতীক স্থাপন করেছে। একইভাবে তারা নাবলূস শহরের খ্রীষ্টান পবিত্র স্থান জব্দ করেছে।- কায়রো : দৈনিক আল-আহরাম ২১.৭.১৯৭০ খৃ.।

গার্ডিয়ান সংবাদদাতা তার পত্রিকায় লেখেন যে, ইহূদী বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হেবরনে আরব সম্পত্তিসমূহ হ'তে তাদেরকে বেদখল করার প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

মেনাহিম বেগিন তাঁর এক বক্তৃতায় ঘোষণা দেন যে, ইস্রাঈলী ক্যাবিনেটের একজন সদস্য হিসাবে এখানে আমার এ কথা ঘোষণা দেওয়ার অধিকার রয়েছে যে, সরকারের নীতি কেবলমাত্র হেবরনকে ইস্রাঈলের সঙ্গে চিরস্থায়ী সংযুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে না। বরং ইস্রাঈলের খোদা কেবলমাত্র আমাদেরকেই এককভাবে পুরা দেশ শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সে কারণেই সকল অধিকৃত ভূমি ইস্রাঈলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আশু যরূরী।

জেরুযালেমের সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিল আল-আক্বছা মসজিদ সম্পর্কে ইহূদী ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকেন। তারা (তৎকালীন) ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ারের নিকট দাবী করেন এই মর্মে যে, আল-আক্বছা মসজিদের নিকট যে খনন কার্য চালানো হচ্ছে, তা এখনই বন্ধ করা হোক। তারা তাকে সতর্ক করে দেন যে, এই খনন কার্যের ফলে মসজিদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়তে পারে।

জেরুযালেমের আরব মুসলিম নেতারা এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেন যে, এই খনন কার্যসমূহ, যা ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ ফুট গভীরে পৌঁছে গেছে মসজিদের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত করবে যেমন ইতিপূর্বকার খননসমূহের ফলে মসজিদের অধিকাংশে দারুণ ক্ষতি হয়েছিল এখানে অগ্নিসংযোগের আগে।

মুসলিম নেতারা আরও বলেন, বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, ইস্রাঈলের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সলেমান মন্দির উদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মসজিদের অভ্যন্তরেই একটি ইহূদী পূজা মন্দির স্থাপন করতে চান।[১০৬] এ ব্যাপারে সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিলের সকল প্রতিবাদ বিফলে গেছে। হায় এই নিশ্ছিদ্র তিমিরাবণের কি অবসান ঘটবে না?

---

১০৬. See details in the Al-Ahram and Al-Jamhuria papers of Cairo in their issues of October 1, 1969.

॥ ২ (পৃ. ১১২) ॥

১৯৬৮ সালে কায়রো, মক্কা এবং আম্মানে ও ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহু সংখ্যক মুসলিম ওলামা ও রাজনীতিবিদ উক্ত সম্মেলনসমূহে যোগদান করেন। এই সকল সম্মেলনে উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলেই ইহূদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানোর ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তারা আরও ঘোষণা করেন যে, জিহাদ ঘোষণার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত কারণসমূহের সবগুলোই ইস্রাঈলের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। যেমন, ইসলামী আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইস্রাঈলের ব্যাপক আগ্রাসন, ইসলামের অধিকাংশ পবিত্র ভূমির অমর্যাদা, আরব (মুসলিম) ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন এবং বয়স্ক ও শিশুদের অমানুষিক ও বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা।

অতএব জান ও মাল দিয়ে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন (General mobilization) অবশ্য যরূরী হয়ে পড়েছে এবং যিনি যে এলাকারই হোন না কেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাধ্যমত উক্ত দায়িত্ব পালন করা।[১০৭]

এর অর্থ এই যে, জিহাদ এমন একটি নির্দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যার আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব বহনে প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষ সম্মত হবেন। অন্যথায় তিনি ভণ্ডামীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব এখন সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর আপতিত হয়েছে। এর কারণসমূহ হ'ল ইস্রাঈলের আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদ, ফিলিস্তিনী আরব মুসলিমদেরকে তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়ন, ইহূদীদের দ্বারা তাদের উপর চরম অবিচার ও নিগ্রহ, আল-আক্বছা মসজিদে অগ্নিসংযোগ, কতকগুলো মসজিদের ধ্বংস সাধন, কতকগুলোকে দখল ও

১০৭. Resolutions and recommendations of the 4th. Congress for Islamic research, Cairo, year 1388 A. H.

সেগুলোর পবিত্রতা হনন প্রভৃতি। এক্ষণে অস্ত্র বহনে সক্ষম এমন প্রত্যেক আরব মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হ'ল ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করা। অন্যদিকে যারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, তাদেরকেও উদারভাবে ও মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান অবস্থায় কোন আরব বা কোন মুসলিমের পক্ষে উপরোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকার কোন অবকাশ নেই।

বিশ্বে ১০০ মিলিয়নের উপরে আরব এবং ৬০০ মিলিয়নের উপরে মুসলিম বাস করেন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এটাই স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক জাতির এক-দশমাংশ অস্ত্র বহনে সক্ষম থাকে। অতএব উক্ত হিসাব অনুযায়ী আরবরা প্রায় ১০ মিলিয়ন ও অন্যান্য মুসলিমগণ প্রায় ৬০ মিলিয়ন যোদ্ধার যোগান দিতে সক্ষম। ইস্রাঈলের বর্তমান (১৯৭০ সালে) জনশক্তি আড়াই মিলিয়নের ঊর্ধ্বে নয়। এক্ষেত্রে আরবরা ও মুসলিমগণ যদি জিহাদে অবতীর্ণ হন, তাহ'লে ইস্রাঈলের অবস্থা কি হ'তে পারে? এছাড়াও আরবদের ও মুসলমানদের বস্তুগত ও নৈতিক শক্তি ইস্রাঈলীদের চাইতে বিস্ময়করভাবে অনেক বেশী। ইস্রাঈলীদের শক্তি সুসংগঠিত। সে কারণ ইস্রাঈলীরা তাদের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা সত্ত্বেও আরবদের বিপুল শক্তিকে অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হচ্ছে। অতএব আরবদের এখন প্রয়োজন কেবল সুষ্ঠু সংগঠনের।

॥ ৩ (পৃ. ১১৫) ॥

ইস্রাঈলের জন্মলগ্ন থেকে আরবরা এবং মুসলমানরা তার প্রতি শুভেচ্ছা দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু যখন আল-আক্বছা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হ'ল, তখনই আরবদের ক্ষোভ জ্বলে উঠল এবং জেরুযালেম ও প্যালেস্টাইনের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব পোষণকারী গভর্ণরদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন শুরু করল।

১৯৬৯-এর ২২ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এই সম্মেলন জেরুযালেম ও প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে আরব ও মুসলিম সমাজের গভীর অনুভূতির প্রতিফলন ছিল। ২৬টি আরব ও মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

অধিকাংশ মুসলিম দেশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে সাগর-উপসাগর থেকে মহাসাগর ব্যাপী সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে একটি ব্যাপক আশাবাদের সূচনা হয় যে, এই সম্মেলনের বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তাবলী শুধুমাত্র নিষ্ফল উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে সমস্ত আরব ও মুসলিম জনসাধারণকে পবিত্র জিহাদের পক্ষে পরিচালিত করবে। কিন্তু সম্মেলন অনুষ্ঠানের ফলে উদ্ভূত উচ্চাশা দপ করে নিভে গেল কয়েকটি মিটিং হওয়ার পর। এর কতকগুলি কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কারণ ছিল, কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা, যা সম্মেলনের মধ্যকার প্রতিটি মিটিংয়েই প্রবলভাবে বিরাজ করছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে অবশ্যই সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাতে করে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুগুলোর উপরে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করা সম্ভব হয়।

সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হ'ল আল-আক্বছা মসজিদে অগ্নিসংযোগের নিন্দা জ্ঞাপন ও ফিলিস্তীনী জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সমর্থন দান। ইস্রাঈলকে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য করার লক্ষ্যে সম্মেলন ঐ সকল দেশের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানায়। যাদের উপরে বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে, যাতে তারা এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেন।[১০৮]

এটা স্পষ্ট যে, সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ছিল বেকার। আশা করা হয়েছিল যে, সম্মেলন জিহাদকালীন যরূরী অবস্থা ঘোষণা করবে এবং প্রত্যেক মুসলিম দেশকে আর্থিক ও নৈতিকভাবে দায়িত্বসমূহ ভাগ করে দেবে এবং এটাও সিদ্ধান্ত নেবে যে, কি পদ্ধতিতে এবং কবে নাগাদ জিহাদ শুরু হবে।

নিশ্চিত ফল লাভের জন্য আরব ও ইসলামী বিশ্বের আবেগকে স্বচ্ছ করার অনুকূলে যে গতি সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল একেবারেই পরিষ্কার। যদি আরবরা সেই গতির অনুসরণ করতে পারত, তাহ'লে তারা নিশ্চিতভাবে ইস্রাঈলী আগ্রাসন রুখতে শুধু পারতই না; বরং জেরুযালেমের পবিত্র ভূমিতে আরব ও

১০৮. See the details of the statement, issued by the Congress in the Al-Ahram Newspaper of 26.9.69.

মুসলিম অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠাতেও সক্ষম হ'ত। যদি আরবরা এখনও এই গতির অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে ইস্রাঈল রাষ্ট্র অবশ্যই একদিন না একদিন নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।

বিশ্ব ইহূদী আন্দোলন তাদের সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের একটি সুপর্যালোচিত পরিকল্পনা পেশ করেছে। এই পরিকল্পনাটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইস্রাঈল তার চূড়ান্ত সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে খুব ধীর ও দৃঢ় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসল নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইহূদী সম্মেলনে বিশ্ব ইহূদী সংবিধান (World Zionism Constitution) রচিত হয় এবং তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়োজিত করা হয়। যার ফল স্বরূপ বিশ্ব ইহূদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থনে ইহূদী উদ্বাস্তুদের আগমন নিয়মবদ্ধ করা হয় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে দিয়ে ১৯০৭ সাল থেকে প্যালেস্টাইনী আরব এলাকাসমূহে কলোনী স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়।

১৯১৭ সালে বেলফোর চুক্তি হয়। এটি ছিল ইস্রাঈলের সর্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক বিজয়। কেননা এ চুক্তির ফলেই ইস্রাঈল তৎকালীন সেরা ঔপনিবেশিক শক্তি গ্রেট বৃটেনের বহু আকাঙ্খিত রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করে।

১৯২৭ সালে প্যালেস্টাইনে ইহূদী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তদনুযায়ী ইহূদী কলোনীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। বিশ্ব ইহূদী আন্দোলন প্যালেস্টাইনের বিরাট এলাকায় জেঁকে বসে। তা চাই ক্রয়ের মাধ্যমে হোক, চাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে জবর দখলের মাধ্যমে হোক।

১৯৩৭ সালে প্রথম বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে পবিত্র ভূমিতে নিয়মিত ইহূদী সেনাবাহিনী গঠনের সূত্রপাত হয়। এছাড়াও সেখানে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক ইহূদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ প্যালেস্টইনের একাংশে আইনগতভাবে ইহূদী স্বদেশ ভূমি (Jewish National Home) প্রতিষ্ঠার অধিকার অনুমোদন করে এবং সেমতে পার্টিশন ডিক্রি (Partition decree) ঘোষণা করে।

১৯৫৭ সালে ইস্রাঈল পূর্ণ নৌ-স্বাধীনতা নিয়ে আক্বাবা উপসাগর দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসা পরিচালনা করে এবং ইস্রাঈলী বন্দর আইলটকে কাজে লাগায়।

১৯৬৭ সালে ইস্রাঈল জর্ডানের পশ্চিম তীর, গাযা, সুয়েজ খালের কিনারা পর্যন্ত সিনাই এলাকা এবং সিরিয়ার (গোলান) মালভূমি দখল করে। যা ইস্রাঈলের উত্তরাংশ জুড়ে আছে এবং যা মিসর, সিরিয়া ও লেবাননের স্বার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষণীয় যে, ইস্রাঈল প্রতি দশ বৎসর অন্তর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তার এক-একটি প্রধান লক্ষ্য হাছিল করে নিচ্ছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ কথা স্বীকার করেন যে, ইহূদীদের সমস্ত প্রটোকল বা পরিকল্পনার খসড়াসমূহ তাদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম ইহূদী সম্মেলনে রচনা করেন। এই সম্মেলন ১৮৯৭-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আগামী একশত বৎসরের মধ্যে বিশ্ব ইহূদী সম্প্রসারণবাদ ও ইহূদী পুনর্বাসন পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করে। আরব ও মুসলমানগণ কি ইহূদীদের উক্ত লক্ষ্য হাছিলের অনুমতি দেবেন?

॥ ৪ (পৃ. ১২০) ॥

ইস্রাঈলের উপর আরব ও মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য এবং সেই কঠিন বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য, যা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতকে সংকটাপন্ন করে রেখেছে, প্রয়োজন কেবল একটি বস্তুর। সেটি হ'ল আমাদের সমস্ত নৈতিক ও মানসিক যোগ্যতাকে সুসংবদ্ধ করা। যাতে তা একটি যথাযোগ্য শক্তি হিসাবে গণ্য হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনয়নে সক্ষম হয়। নিশ্চয়ই তা ইস্রাঈলী সম্প্রসারণ ও ইহূদী পুনর্বাসন পরিকল্পনায় নৈরাশ্য ডেকে আনবে। পক্ষান্তরে সমস্ত রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, যতদিন আরব ও মুসলিমগণ দুর্বল থাকবে। কিন্তু যখনই তারা শক্তিশালী হবে, তাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

Contents

১৯৬৭ সালের পর থেকে ইস্রাঈলকে নিন্দা করে ও অধিকৃত আরব এলাকা থেকে তাঁর সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ও সাধারণ পরিষদে বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইস্রাঈল সকল প্রস্তাবকে পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে গেছে। একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানোর জন্য জাতিসংঘ এবং চারটি বৃহৎ শক্তি রাজনৈতিকভাবে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সেই সব প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এখন সামরিক সমাধান ব্যতীত আরবদের জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই, যা কেবলমাত্র শক্তির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হবে?

॥ ৫ (পৃ. ১২১) ॥

১৩ হিজরী সনে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও জর্ডান বিজয়ের উদ্দেশ্যে সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যেমন কৌশল তারা তাদের শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত।

রোমান কৌশলের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা সৈন্যদলকে সম্মুখ ভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ, মোট তিনভাগে ভাগ করত এবং দুই পাশে দু'টি বিশেষ সেনা ইউনিট রাখত, ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির অধীনে প্রতিটি ব্যাটেলিয়ানে ১০০০ হাযার করে যোদ্ধা থাকত। এই ব্যাটেলিয়নকে (ল্যাটিন ভাষায়) 'কারদাস' (Kardous) বলা হ'ত।[১০৯]

খালেদ (রাঃ) ইতিপূর্বে আরবদের গৃহীত সকল কৌশল বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে তার সেনাদলকে ৩৬টি কারদাসে ভাগ করলেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমূকের ময়দানে সিদ্ধান্তকারী বিজয় লাভ করলেন।[১১০] খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) যদি উক্ত যুদ্ধে আরবদের পুরাতন কৌশল অবলম্বন করতেন, তাহ'লে তিনি কখনোই জয় লাভ করতে পারতেন

---

১০৯. ১০০০ সৈন্যের প্রতিটি কারদাস ১০টি ডিভিশনে বিভক্ত থাকতো। বিস্তারিত দেখুন- Leaders of the conquest of Iraq and the Island, p. 167. ল্যাটিন ভাষায় 'কারদাস' বলা হ'লেও আরবীতে 'কুরদূস' (كُرْدُوس) বলা হয়েছে।

১১০. ত্বাবারী, ৫৬৩-২; ইবনুল আছীর, ১৫৮-২।

না। ইস্রাঈল সামগ্রিক যুদ্ধ পদ্ধতিতে (Collective war system) বিশ্বাস করে। এই যুদ্ধ পদ্ধতিতে সে তার সমস্ত বস্তুগত ও নৈতিক যোগ্যতাকে কাজে লাগায় এবং যুদ্ধের পিছনে নিয়োজিত করে।

১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে ইস্রাঈল তার পূরা জনশক্তির ১১ শতাংশকে যুদ্ধে নিয়োজিত করে। অথচ আরবরা করেছিল মাত্র ৩০০০ হাযার ব্যক্তিকে। ইস্রাঈল তার অন্যান্য বস্তুগত যোগ্যতাকেও যুদ্ধের সময় কাজে লাগায়। এমনকি হকারদের ব্যবহৃত ঠেলাগাড়ীও যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। সে তুলনায় আরবরা তাদের বস্তুগত যোগ্যতাসমূহের কতটুকু যুদ্ধে লাগাতে পেরেছে? ইস্রাঈল তার পূরা নৈতিক শক্তিকে যুদ্ধে লাগাতে সক্ষম ছিল। সে তুলনায় আরবরা কতটুকু তাদের নৈতিক সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে?

আরব ও মুসলিমদের সামগ্রিক যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হবে। যে পদ্ধতির অনুসরণ করত আরবরা ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে। যেমন পাক কালামে বলা হয়েছে :

‘তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড় হালকা অথবা ভারী রণ সম্ভার নিয়ে এবং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড় আল্লাহ্র রাস্তায় তোমাদের জান ও মাল নিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা বুঝ’ *(তওবা ৯/৪১)*।

আমাদের সেই সব পূর্ব পুরুষ বীর-যোদ্ধাদের উত্তরসূরী সন্তানেরা কি বিংশ শতাব্দীতে এসে পুনরায় সামগ্রিক যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগে সক্ষম নয়? চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী কোনদিন এককভাবে দায়িত্ব নিতে পারে না। বরং সমগ্র জাতি এর জন্য দায়িত্বশীল। সেনাবাহিনী সম্মুখভাগ (Spar-head) হিসাবে যুদ্ধ করে মাত্র। কোন আরব বা মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিজেকে এ ব্যাপারে কোনরূপ দায়িত্বমুক্ত বলে দাবী করতে পারে না এবং নিজেকে একজন সাধারণ দর্শক হিসাবে ভাবতে পারে না।

প্রত্যেক আরব ও মুসলিম জনশক্তিকে এমন ঠিক ঠিক প্ল্যান মোতাবেক যুদ্ধের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে প্রত্যেক সৈনিক বুঝতে পারে যে, তার কাজ কি এবং কিভাবে সে কাজ সর্বোত্তম পন্থায় সম্পাদন করা যাবে।

অস্ত্র বহনে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালোভাবে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শিখতে হবে কিভাবে যুদ্ধের সময়ে অন্য সৈন্যদের সহযোগিতা করতে হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাদেরকে সুসজ্জিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে একটি দায়িত্বশীল কম্যাণ্ডের অধীনে একটি ইউনিটে সুসংগঠিত করতে হবে।

আরব ও মুসলিম জনশক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

(ক) যারা ইস্রাঈলের প্রতিবেশী (Those neighbouring to Israel p. 124) :

এই এলাকার সকল অস্ত্র বহনে সক্ষম লোকদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে অথবা শত্রুর লক্ষ্য হ'তে পারে এমন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহের রক্ষী হিসাবে থাকতে হবে অথবা 'ফেদাঈন' উদ্ধারকারী সংগঠনে (Fedayiin Redeemers Organization) যোগদান করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে এবং সে তা প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টিত থাকবে।

(খ) যারা ইস্রাঈলের প্রতিবেশী নয় (Those not neighbouring to Israel p. 124) :

তাদের মধ্যে অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যক্তিগণ সরাসরি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে অথবা ঐ সমস্ত যেলার স্থায়ী সেনা ইউনিটে যোগদান করবে, যেসব এলাকা থেকে সরাসরি দুশমনের বিরুদ্ধে হামলা করা সম্ভব হয়। যেমন জর্ডান, সিরিয়া বা মিসর।

॥ ৬ (পৃ. ১২৫) ॥

অস্ত্রবহনে সক্ষম আরব ও মুসলিম জনসাধারণের প্রশিক্ষণ, সংগঠন ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রসহ যুদ্ধে যোগান দেওয়ার জন্য আবশ্যক উচ্চতর গুণসম্পন্ন সামরিক কম্যাণ্ডের।

এই কম্যাণ্ডকে দুই ধরনের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হবে। (১) নৈতিক সমর্থন ও (২) বস্তুগত সমর্থন।

নৈতিক সমর্থন অত্যন্ত ফলদায়ক যা সৈন্যদের মধ্যে অর্থ ও জীবনের যেকোন মূল্যের বিনিময়ে জয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধে নিয়োজিত থাকার মত কঠিন মনোবল সৃষ্টি করে।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবিক ১৩ হিজরী সনে মুসলিম ও রোমক সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক ইয়ারমূকের চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে একজন সৈনিক প্রধান সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'রোমক বাহিনী কি বিরাট সে তুলনায় মুসলিম বাহিনী কতই না ক্ষুদ্র'! উত্তরে খালেদ (রাঃ) সাথে সাথে বললেন, 'রোমক বাহিনী কতই না ক্ষুদ্র, মুসলিম বাহিনী তার তুলনায় কি বিরাট! কেননা জয়লাভের ফলে সৈন্যসংখ্যা বাড়ে এবং পরাজয়ের ফলে কমে যায়'।[১১১]

খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন? তিনি সৈন্যবল ও অস্ত্রবলকে অধিক গুরুত্ব দেননি। বরং গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ও সাধারণভাবে জনগণের নৈতিক মনোবলকে। নেপোলিয়ন (১৭৬৯-১৮২১ খৃ.) বলতেন, 'নৈতিক শক্তির সাথে বস্তুগত সামর্থ্যের তুলনার হার হ'ল ৩ ঃ ১। অর্থাৎ একটি সেনাবাহিনীর নৈতিক শক্তির মূল্যায়ন হ'ল শতকরা ৭৫ ও বাকী ২৫ হ'ল বস্তুগত সামর্থ্যের।[১১২]

বড় বড় সামরিক নেতৃবৃন্দ ও সামরিক দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ নেপোলিয়নের উক্ত মতকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

জেনারেল ফাউলার (Fowler) নামক জনৈক আধুনিক বিশেষজ্ঞ নেপোলিয়ানের উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি তার Arms and History নামক বইয়ে লেখেন যে, যুদ্ধের সময় নৈতিক ও বস্তুগত শক্তি-

---

১১১. قَالَ رَجُلٌ لِخَالِدٍ: مَا أَكْثَرَ الرُّومَ وَأَقَلَّ الْمُسْلِمِينَ! فَقَالَ خَالِدٌ: مَا أَقَلَّ الرُّومَ وَأَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنَّمَا تَكْثُرُ الْجُنُودُ بِالنَّصْرِ وَتَقِلُّ بِالْخِذْلانِ– *(ত্বাবারী ৩/৩৯৮)*। -অনুবাদক।

১১২. Napoleon used to say : The importance of morale in comparison to material forces is in the ratio of 3:1 or in other words the morale evaluation of an army counts 75 percent while the material evaluation counts only 25 percent. p. 126.

সামর্থ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান সমান। তিনি নীতিগতভাবে (in principle) নেপোলিয়নের মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের বিস্তারিত আলোচনায় (in details) যেয়ে উক্ত মতের সঙ্গে বৈপরীত্যও প্রকাশ করেছেন।[১১৩]

মনোবল (Morale) একটি মতবাদের (Doctrine or dogma) সঙ্গে তুলনীয় (Synonymous)। কোন সেনাবাহিনী বা কোন জনতার পক্ষে জয়লাভ সম্ভব নয় একটি মতবাদ ছাড়া, যাকে সে বিশ্বাস করে এবং তা রক্ষার জন্য জীবন ও সম্পদ কুরবানী করে।

একই জাতিভুক্ত জনগণের মধ্যে এবং একই সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে মন ও হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূল উৎস হ'ল মতবাদগত ঐক্য। এই ঐক্যবোধ সকল ব্যক্তি ও গ্রুপের মধ্যে এবং জনস্বার্থের সেবায় সকলকে পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে পরিচালিত করে।

মতবাদের ভিন্নতা একটি সেনাবাহিনী বা একটি জাতিকে পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে বিরত রাখে। বরং তা একটি সৈন্যদলকে সশস্ত্র বাদক দলে এবং একটি জাতিকে দ্বন্দ্বমুখর জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে।[১১৪] আরবদের মতবাদ (Doctrine) হ'ল ইসলাম[১১৫], যা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে বিজয়ের পথে পরিচালিত করে আসছে। যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলাম তাদেরকে পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ইসলাম আরবদের অন্তঃকরণসমূহকে আত্মসংযম, নিয়মপ্রীতি এবং সত্যের জন্য শাহাদত বরণের গভীর আগ্রহে ভরপুর করে দিয়েছে। ইসলাম আরবদের শাহাদত লাভকে শ্রেষ্ঠতম বিজয় হিসাবে দেখতে শিখিয়েছে এবং তাদেরকে আত্মমর্যাদাও দিয়েছে এই গভীর বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে তাদের কিছু করণীয় আছে।

---

১১৩. বিস্তারিত দেখুন- The Arab Military Unity, p.129-30.

১১৪. Differences with regard to doctrines among the members of the same army or same nation prevent co-operation and transform an army into armed bands and a nation into conflicting masses. p.127.

১১৫. ইসলাম কোন মতবাদের নাম নয়। বরং একটি পথের নাম। যা এসেছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে। অন্যদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সম্ভবতঃ মাননীয় লেখক 'মতবাদ' বলে থাকবেন। -অনুবাদক।

ইবনে খালদূন (৭৩২-৮০৮ হি./১৩৩২-১৪০৬ খৃ.) আরবদের জন্য একটি মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তার 'আল-মুক্বাদ্দিমা' (Introduction) গ্রন্থে লেখেন যে, 'আরবরা কখনোই সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না একটি গভীর ধর্ম বিশ্বাসকে তারা বরণ করতে পারবে। যা নবুঅত অথবা কোন মহান উত্তরাধিকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।[১১৬]

ইসলাম থাকলে আরবরা থাকবে। ইসলাম না থাকলে আরবরা ধ্বংস হবে।[১১৭] আরবদের ব্যাপারে যা সত্য, বিশ্বের সকল অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য তা সত্য। আরব এবং মুসলিমগণ ইহূদীদের সঙ্গে লড়াই করছে। ইহূদীরা তাদের মতবাদের সঙ্গে সকলে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, যা ইহূদী ধর্ম দ্বারা অণুপ্রাণিত।

ইহূদী সেনাবাহিনীতে বহুসংখ্যক পুরোহিত রয়েছে। যারা প্রধান সামরিক পুরোহিতের অধীনে পরিচালিত। এই পুরোহিতগণ অন্যান্য সৈন্যদের চেয়ে আলাদা কর্তৃত্ব ভোগ করে।

বাইবেলের উপরে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রশ্নোত্তর পরিচালিত হয়। তাতে বিজয়ী সৈনিকদেরকে সম্মানিত করা হয় এবং তাদের মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হয়।

সকল স্তরের ইহূদী অফিসারগণ 'ক্রন্দনরত দেওয়ালের' (Wailing wall) পাশে গিয়ে তাদের নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে। যেখানে ইস্রাঈলী ছত্রীসেনারা (Parachute unit) একহাতে বন্দুক অপর হাতে বাইবেল নিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।[১১৮]

১৯৭০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর যখন চারবার্গ (Cherbourg) বন্দর থেকে ছয়টি সামরিক মোটরবোট চুরি হয়ে যায় এবং পরে তা নিরাপদে হাইফা বন্দরে ফিরে আসে, তখন মোশে দায়ান বলেছিলেন, মোটর বোটগুলো বিনা সৈন্য প্রহরায় পরিচালিত হয়েছে। এগুলি সাগরের মাঝ থেকেই পুনরায় জ্বালানী নিতে সক্ষম হয়েছে এবং নিরাপদে ফিরে এসেছে। এটা এজন্য নয়

---

১১৬. বিস্তারিত দেখুন- Introduction, by Ibn Khaldun. Beirut 1967. p. 266-1.

১১৭. বিস্তারিত দেখুন- Arab Military Union, p. 134-35.

১১৮. The British newspaper : The Guardian' quoting the 'Al-Jamhouria' paper of Cairo, dated 31.3.1969.

যে, তাদের প্রত্যেকটিতে চারটি করে মোটর ছিল। বরং কেবল এজন্যই সম্ভব হয়েছে যে, স্বর্গীয় সুর ও আত্মা দ্বারা এগুলি পরিচালিত হয়েছিল। পবিত্র বাইবেলে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যখন পৃথিবী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরে যাবে, তখন খোদায়ী আত্মা পানির উপরে ভেসে বেড়াবে'।[১১৯]

এটা জানা কথা যে, কোন মতবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না বা তাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না অন্য একটি মতবাদ ছাড়া এবং একটি বিশ্বাসকে অপর একটি বিশ্বাস ছাড়া।

উপরের আলোচনা আরব ও মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

॥ ৭ (পৃ. ১২৯) ॥

দ্বিতীয় সমর্থন, যার উপরে আরব ও মুসলিম সামরিক কম্যাণ্ডগুলো নির্ভর করে, সেটি হ'ল অর্থ (Money)। অর্থ যুদ্ধের জন্য স্নায়ু সদৃশ। অর্থ ছাড়া যুদ্ধ পূরোপুরি ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, অস্ত্র–শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য সরবরাহ, মেডিকেল যান ও অন্যান্য যানবাহন এবং নেতৃত্ব। অর্থ থাকলে এগুলির ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু অর্থ না থাকলে এসবের কিছুই যথাযথভাবে করা সম্ভব নয়। সাধারণ যোদ্ধাদের জন্য যা প্রয়োজন হয়, নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য তাই-ই প্রয়োজন হয়ে থাকে। যোদ্ধাদের উচ্চ মনোবল যুদ্ধ জয়ের একটি প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এই শক্তি বজায় থাকতে পারে না, যদি না তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরিবার সচ্ছল অবস্থায় আছে।

সৈনিকদের যে বেতন দেওয়া হয়, তা পর্যাপ্ত হওয়া উচিত। যাতে তাদের পরিবারবর্গ ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কেননা এটা আশা করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয় যে, একজন সৈনিক যুদ্ধের ঝুঁকি ও কষ্ট বরণ করে নেবে, অথচ তার চিন্তা-ভাবনা থাকবে যুদ্ধের ময়দান থেকে বহু দূরে স্বীয়

---

১১৯. The 'Al-Jamhouriah', dated 16.1.1970. এগুলি স্রেফ মনভুলানো রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি ছাড়া কিছুই নয়।- অনুবাদক।

Contents

পরিবারের কাছে। বিশেষ করে যদি সে তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হয়, যার অভাবে পরিবার উপোস থাকবে।

প্রত্যেক সৈনিকের জন্য নির্ধারিত আর্থিক আয় নিশ্চিত করতে হবে। পবিত্র যুদ্ধ বা জিহাদ পরিচালনার জন্য দান বা চাঁদার উপরে পূরোপুরি নির্ভরশীল হ'লে চলবে না, যা কখনো উল্লেখযোগ্য হারে আবার কখনো অল্পমাত্রায় সংগৃহীত হয়। এমনকি কখনো এর প্রয়োজনীয় সংগ্রহের অভাবে যুদ্ধ বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

প্যালেস্টাইনকে কলোনী বানানোর জন্য চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৮৯৭ সালে প্রথম ব্যাসল সম্মেলনেই। সে মতে সম্মেলন শেষ হওয়ার সাথে সাথে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় কেবল চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই। ১৮৯৮ সালে 'ইহূদী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় কলোনীসমূহের জন্য। ১৯০১ সালে গঠিত হয় 'জাতীয় ইহূদী ফাণ্ড'। ইহূদী, নন-ইহূদী সকলেই বিশ্বব্যাপী চাঁদা সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন এবং সকল প্রকারের মাধ্যম এজন্য ব্যবহার করা হ'তে থাকে।

পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের একজন মাত্র ইহূদীও উক্ত ফাণ্ডে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে বাধ্য। যার যে চাঁদা ধরা হয়, তার চাইতে সে কমাতেও পারে না এবং তা থেকে বিরত থাকতেও পারে না। যে চাঁদা তার উপরে ধার্য করা হয়, তা তার মাসিক আয়ের অনুপাতেই ধরা হয়। যাতে তার উপরে সাধ্যাতীত বোঝা না হয়ে পড়ে। তহবিল সংগ্রহের যে নির্দিষ্ট পথ-পন্থা রয়েছে, তাতে ইহূদীরা তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট বাজেট তৈরী করতে পারে, যা সংকটকালে বা অজানা কোন দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

এমনিভাবে আরব রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও জনগণ এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও জনগণ সকলে মিলে ফিলিস্তীনী যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা চালানো উচিত। আরবদের উচিত একটি 'প্যালেস্টাইন ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করা। যার শাখা প্রতিটি মুসলিম দেশে থাকবে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানো, তাদের বেতন প্রদান, তাদের পরিবার পোষণ এবং শহীদ যোদ্ধাদের পরিবার সমূহকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান।

এসব তহবিলে অর্থ সংগ্রহ হবে সুনির্দিষ্ট চাঁদা সংগ্রহ এবং আয়ের এক-দশমাংশ (One-tenth) (ওশর) গ্রহণের মাধ্যমে। যেহেতু আল্লাহ, স্বীয় পাক কালামে তাঁর রাস্তায় নিজ নিজ আয় থেকে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি অতি আশাবাদী হ'তে চাই না। তবে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আরব এবং মুসলমানদের মধ্যে বহু গুণী ব্যক্তি রয়েছেন। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তথাপি কল্পিত অংকের অর্থ সংগ্রহের পথে যেসব প্রতিবন্ধক খাড়া হয়, তার কারণ হ'ল, বহুসংখ্যক তহবিল সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে এমন আগ্রহী দাতা আছেন, যারা বুঝতেই পারেন না যে, কোথায় টাকাটা দিতে হবে।

প্রত্যেক যেলা, নগরী, শহর ও গ্রামে নিয়োজিত প্যালেস্টাইন তহবিলের আদায়কারীগণ অবশ্যই নিজ নিজ এলাকায় সাধুতা ও আনুগত্যের জন্য প্রসিদ্ধ হবেন। যারা প্রত্যেক চাঁদা দাতাকে পৃথক পৃথক রশিদ দেবেন, যা প্যালেস্টাইনী যোদ্ধাদের জন্য চাঁদার প্লাবন ডেকে আনবে।

যারা ধর্মের সেবায় নিয়োজিত, তারা এ ব্যাপারে বড় সাহায্যকারী হ'তে পারেন। প্যালেস্টাইনী যোদ্ধাদের সেবায় ও প্যালেস্টাইন স্বার্থের পক্ষে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে তারা বিশ্বের সম্মুখে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, তারা যা বক্তৃতা করেন, তা কেবল শূন্যগর্ভ কথার ফুলঝুরি নয়।

বিজ্ঞ সামরিক কম্যাণ্ড জিহাদকে একটি গঠনমুখী বাস্তব কর্মকাণ্ডে পরিণত করতে পারেন। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত যোদ্ধাদের সংগঠন কিভাবে হবে, তার একটি বিস্তৃত ধারা নিম্নে বর্ণিত হ'ল :[১২০]

(ক) প্রতিটি আরব ও মুসলিম নগরীতে সৈনিকদের জন্য সামরিক কম্যাণ্ডের একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটিতে নিয়মিত বা অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কমিশণ্ড ও নন-কমিশণ্ড অফিসারদের মধ্য থেকে যারা উচ্চ দক্ষতা ও গভীর আনুগত্যের জন্য খ্যাত, তাদেরকে নেয়া হবে।

এই কমিটির প্রধান কাজ হবে যোদ্ধাদের একত্রিত করা, তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা, তাদেরকে বিভিন্ন সৈন্যদলে (Regiment) সংগঠিত করা এবং অবশেষে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

---

১২০. পরিশিষ্ট 'ক'-তে বিস্তারিত চিত্র দেখুন।

সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানবত্তায় প্রসিদ্ধ জাতির আধ্যাত্মিক নেতাদের সমন্বয়ে একটি আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড কমিটি গঠন করতে হবে। যারা জান ও মালের তোয়াক্কা না করে যেকোন মূল্যের বিনিময়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্যদের ঈমানকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে সামরিক কম্যাণ্ড কমিটিকে সাহায্য করবেন।

আধ্যাত্মিক কম্যাণ্ড কমিটিকে অধিকতর ফলদায়ক করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক আধ্যাত্মিক নেতাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সক্রিয় সেবাদান করতে হবে।

উপরোক্ত দু'টি কমিটি বাদে (ক) সৎ ও অনুগত ব্যক্তিদের দিয়ে একটি 'অর্থ কমিটি' থাকবে। যাদের কাজ হবে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা। অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা। আর্থিক উৎসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন দেওয়া, তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করা এবং শহীদ পরিবারগুলোর দেখাশুনা করা।

(খ) প্রত্যেক আরব ও মুসলিম দেশে একটি করে আঞ্চলিক কম্যাণ্ড কমিটি থাকবে। যাতে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ও নন কমিশণ্ড স্বেচ্ছাসেবীগণ থাকবেন।

এই কমিটির কাজ হবে বিভিন্ন কমিটির মধ্যে কাজের সমন্বয় করা, যাতে এটা সব সময় নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় যে, সৈন্যরা যথাযথভাবে অস্ত্র সজ্জিত আছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলেই সাথে সাথে তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে। এছাড়া এ কমিটি অর্থ সংক্রান্ত কমিটি ও আধ্যাত্মিক কমিটিকেও তাদের কার্যে সহায়তা দান করবে।

(গ) জেনারেল কম্যাণ্ড কাউন্সিলের কেন্দ্র থাকবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং তার কাজ হবে আরব ও মুসলিম যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরিচালনা করা।

এই কমিটিতে থাকবেন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ। যারা তাদের সাধুতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ, সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। একজন ভাল নেতার জন্য উপরোক্ত গুণগুলি খুবই পরিচিত। কিন্তু আমি এখানে সাধুতাকেই সবার উপরে জোর দিতে চাই।

নিম্নে এর একটি উদ্ধৃতির সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হচ্ছে। যা নেওয়া হয়েছে আল-হারছামী (Al-Harthamy মৃ. ২৪৩ হি.) প্রণীত A Summary of War Policies নামক গ্রন্থ (পৃ. ১৫) থেকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'একজন সেনানায়ক অবশ্যই নিজেকে আল্লাহভীতির অস্ত্রে সজ্জিত করবে। সে কখনোই আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত হবে না। সে তাঁর উপরেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং প্রার্থনা করবে তিনি যেন তার জন্য বিজয় ও নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন। তাকে নিজের দুর্বলতা ও অসামর্থ্যতা সম্পর্কে সদা সজাগ থাকার সাথে সাথে স্বর্গীয় হেদায়াত ব্যতিরেকে সে যে কিছুই করতে পারে না, সে কথাও মনে রাখতে হবে। তাকে সর্বদা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করতে হবে। একজন নেতা যখন বিজয়ী হবেন, তখন তাকে অবশ্যই যাবতীয় পাপ, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা হ'তে বিরত থাকতে হবে। তাকে সুবিচারক হ'তে হবে। জনগণের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী হ'তে হবে এবং সর্বদা সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে'।

হারছামী উপরে যেসব গুণের কথা বলেছেন, এসব গুণের কথা আমাদের সকল প্রাচীন আরব ও মুসলিম লেখকগণ বলেছেন। কিছু লোক আছেন যারা আরব ও মুসলিম মনীষীদের মতামতে সন্তুষ্ট হ'তে চান না। এ ব্যাপারে তারা বরং বিদেশী লেখকদের মতামতের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে চান।

এসব লোকের জন্য আমি জেনারেল মন্টগোমারীর (Montgomery) একটি মত উদ্ধৃত করতে চাই তাঁর The Road to Command নামক বই থেকে। যা ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং যাতে সামরিক কম্যাণ্ডের উপর এ যাবৎকালের সর্বশেষ গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্টগোমারী লিখেছেন, ধর্ম এবং সামরিক কম্যাণ্ডের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? একজন নেতার জন্য অবশ্যই থাকতে হবে আদর্শসমূহ (Ideals), যার প্রতি তিনি যত্নবান হবেন এবং থাকতে হবে ধর্মীয় গুণাবলী যা তিনি ধারণ করবেন। তিনি আরও বলেন, একজন নেতার ব্যক্তিগত জীবন কি তার পেশার (Career) উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে? কিংবা তাকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে? আমার মতে নেতা হওয়ার জন্য প্রধান বিষয় হ'ল তার বিশ্বস্ততা (Loyalty),

তার দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র এবং বিশেষ করে ধর্মীয় গুণাবলীর প্রতি আনুগত্য। আমি বুঝতেই পারি না, একজন ব্যক্তি কিভাবে নেতা হ'তে পারেন, যদি তার ব্যক্তিগত জীবন সন্দেহের ঊর্ধ্বে না হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন নেতার সফলতার জন্য নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলী সহ ন্যায়পরায়ণতাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'।

একজন নেতার জন্য যা সত্য, সৈনিকদের জন্য তাই-ই সত্য।

আরব বিজয়ের পরবর্তীকালের অধিকাংশ আরব ও মুসলিম নেতাগণ, যারা বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছেন, সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। যেমন গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি./১১৩৮-১১৯৩ খৃ.), যিনি ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুযালেমে ক্রুসেডারদের পরাজিত করেছিলেন। আল-মুযাফফার সাইফুদ্দীন কুতুয (মৃ. ৬৫৮ হি./ ১২৫৯ খৃ.), যিনি ৬৫৮ হিজরীতে 'আইনে জালূত (Ain jalout) নামক স্থানে তাতারদের পরাজিত করেন। উছমানীয় খলীফা সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ (৮৩৩-৮৮৫ হি./১৪২৯-১৪৮০ খৃ.), যিনি ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করেন। এইসব নেতাগণ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক।

ইয বিন আব্দুস সালাম (৫৭৭-৬৬০ হি./১১৮১-১২৬১ খৃ.) এবং শেখ আবুল হাসান আশ-শাযিলী আল-মাগরেবী (৫৭১-৬৫৬ হি./ ১১৭৫-১২৫৮ খৃ.) নামক দুইজন ইমাম তাতারদের বিরুদ্ধে জয়লাভে কুতুযকে সাহায্য করেন। তাঁদের অবিরত ধর্মীয় প্রচারণার ফলে কুতুয বুঝতে সক্ষম হন যে, পরিশেষে একমাত্র জিহাদই ঈমানদারগণকে চূড়ান্ত বিজয় অথবা গৌরবমণ্ডিত শাহাদতের পথে পরিচালিত করতে পারে।

আমরা এখন সবচাইতে প্রয়োজন অনুভব করছি ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), ইয বিন আব্দুস সালাম (রহঃ), আবুল হাসান আশ-শাযিলী (রহঃ) প্রমুখ নেতার মত ব্যক্তিত্ব, যারা কোনকিছুর হিসাব না করে নিজেদের যথাসর্বস্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কুরবানী দিতে পারেন।[১২১]

১২১. উক্ত মহান ব্যক্তিগণের নাম সংশোধন ও তাদের জন্ম-মৃত্যু সালগুলি আমরা যোগ করে দিলাম।-অনুবাদক।

॥ ৮ (পৃ. ১৩৮) ॥

আমি সৈনিকদের জন্য একটি সামরিক সংগঠনের আলোচনার মধ্যেই আমার বক্তব্য কেন্দ্রীভূত রাখতে চেষ্টা করেছি। যাতে তারা আধুনিক সমরকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইস্রাঈলের মত একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে পারে।

আমি ফেদাঈন (গেরিলা) সংগঠন কিংবা নিয়মিত সেনাবাহিনীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিনি। কেননা তাদের সংগঠন বর্তমানে পুরোপুরি সন্তোষজনক।

বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিভিন্ন অভিযানে কৃতকার্যতা লাভের কারণে ফেদাঈনের বর্তমান সংগঠন ভবিষ্যতে জিহাদ সংগঠনের জন্য উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে। ইস্রাঈলের অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে এবং বিদেশে ফেদাঈনদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য ফল বহন করে এনেছে।

ফেদাঈন গেরিলারা আরব মনোবলকে উজ্জীবিত করেছে। তারা প্যালেস্টাইনীদেরকে সংগঠিত হ'তে সহায়তা করেছে এবং তাদেরকে একটি সক্রিয় ও আকর্ষণীয় শক্তিতে পরিণত করেছে, যা ইহূদী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে নিশ্চিত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

বিদেশে ফেদাঈনরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। রক্তের প্রথম অভিজ্ঞতার (Baptism of Blood) মধ্য দিয়ে মিছিল করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে এ কথা যে, হৃতভূমি পুনরুদ্ধার করতে যতদিন সময় লাগুক না কেন এবং যতকিছুই তাদের খোয়াতে হোক না কেন, তারা কখনোই তাদের ন্যায্য দাবী পরিত্যাগ করবে না।

ফেদাঈনরা প্যালেস্টাইন ইস্যুর প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং তাদের তৎপরতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভীত করে তোলে। রক্ত ঝরানোর আগ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন প্রশ্ন একটা ইস্যু মাত্র ছিল, যা উল্লেখযোগ্য কোন ফলাফল ছাড়াই কয়েকবার মাত্র জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল।

ফেদাঈন তৎপরতার ফলে অধিকৃত এলাকাসমূহে ইহূদীদের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। অধিবাসীদের মধ্যে সর্বদা ত্রাস বিরাজ করছে। ইস্রাঈল তার পর্যটন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইহূদী উদ্বাস্তুদের আগমন স্রোত বন্ধ হয়েছে। অধিকন্তু এর ফলে ইস্রাঈলী সশস্ত্র বাহিনী পোষণের খরচ দ্বিগুণ হয়েছে।

ফেদাঈনদের সাফল্যের মাত্র কতকগুলো দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হ'ল। তারা যথার্থই জাতির গভীরতম শ্রদ্ধা ও সর্বোচ্চ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ফেদাঈনগণ পবিত্র যোদ্ধা। তাদের অগ্রণী অভিজ্ঞতা বাস্তবক্ষেত্রে ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। যদিও সারা বিশ্বে আরব ও মুসলিম জনসাধারণের তুলনায় তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। মুজাহিদদের সহযোগিতায় যদি এদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা যেত, তাহ'লে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? ইস্রাঈলীদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যেত। তারা সেই কথা পুনর্ব্যক্ত করত, যা তাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিল যে, 'এই এলাকার লোকেরা আসলে দৈত্য'।[১২২]

বিশ্বাসীরা তখন আল্লাহ্র জয়গানে আনন্দ মুখর হয়ে উঠত। আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেব না, যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। আদন নামক জান্নাতে, পবিত্র গৃহসমূহ দান করবেন এবং এটাই (তোমাদের জন্য) বিরাট সফলতা। এছাড়া আরও রয়েছে যা তোমরা চাও, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (হে নবী!) তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও' *(ছফ ৬১/১০-১৩)*।

জয়ের রাজপথ কেবল একটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর গভীর বিশ্বাস এবং জান ও মালের বিনিময়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। আল্লাহ বড় মহান। তাঁর জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমার নেতা, আল্লাহ্র নবী ও মুজাহিদগণের ইমাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর।

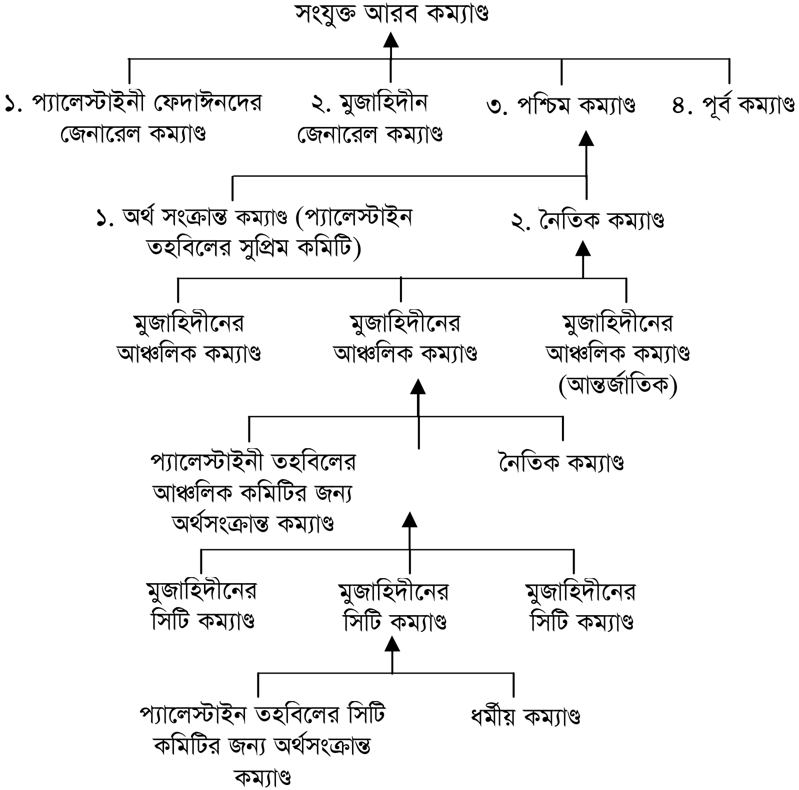
---

১২২. যারা ভয়ে নবী মূসা (আঃ)-কে বলেছিল, قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ– 'হে মূসা! আমরা কখনও ঐ শহরে প্রবেশ করব না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করে। অতএব আপনি ও আপনার রব (আল্লাহ) গিয়ে (ওদের সাথে) যুদ্ধ করুন! আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। ঐ সময় সেখানে বিশালদেহী আমালেক্বাদের রাজত্ব ছিল।-অনুবাদক।

Contents

পরিশিষ্ট-ক (পৃ. ১৪২)

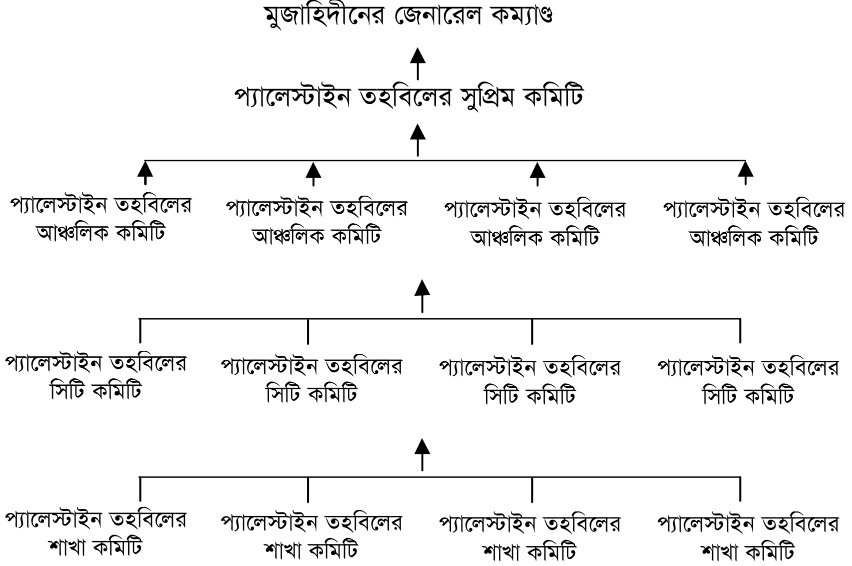
মুজাহিদীন (Holy Warriors) সংগঠন



Contents

পরিশিষ্ট-খ (পৃ. ১৪৩)

প্যালেস্টাইন তহবিলের জন্য কম্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সংগঠন



Contents

পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ'-এর মন্তব্য সমূহ :

১. প্যালেস্টাইন তহবিলের সর্বোচ্চ কমিটি সকল আঞ্চলিক কমিটির জন্য রশিদ বই (Official receipt) সরবরাহ করবে।

২. সংগৃহীত সকল অর্থ অবশ্যই ব্যাংকসমূহে জমা থাকবে। 'প্যালেসটাইন তহবিল' নামে প্রত্যেক কমিটি নির্দিষ্ট ব্যাংকে বিশেষ একাউন্ট খুলবে।

৩. কমিটিসমূহের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রত্যেক কমিটি তার উচ্চতর কমিটির নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে।

৪. 'প্যালেস্টাইন তহবিলে'র আয় সুনির্দিষ্ট রাখার জন্যে আমি চাই যে, প্রত্যেক আরব ও প্রত্যেক মুসলিম স্বীয় মাসিক আয়ের এক-শতাংশ প্যালেস্টাইন তহবিলে দান করবে এবং উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ দান করাটা স্বেচ্ছা ভিত্তিক হবে।

৫. কমিটিসমূহের অবস্থান :

(ক) সর্বোচ্চ কমিটি যুদ্ধের ময়দানের নিকটবর্তী হবে এবং মুজাহিদীনের জেনারেল কম্যাণ্ডের সাথে সর্বদা গভীর যোগাযোগ রাখবে।

(খ) আঞ্চলিক কমিটিগুলি আরব বা মুসলিম রাজধানীসমূহে থাকবে যা মুজাহিদীনের আঞ্চলিক কম্যাণ্ডের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখবে।

(গ) 'নগর কমিটি'গুলি মুজাহিদীনের নগর কমিটিসমূহের সন্নিকটে স্থাপিত হবে।

(ঘ) 'নগর কমিটি' কর্তৃক মনোনীত স্থানসমূহে শাখা কমিটিসমূহ স্থাপিত হবে।

পরিশিষ্ট-গ (পৃ. ১৪৬)

মুজাহিদীনের নৈতিক কম্যাণ্ড গঠন

মুজাহিদীনের জেনারেল কম্যাণ্ড

↑

মুজাহিদীনের সুপ্রিম নৈতিক কম্যাণ্ড

↑

মুজাহিদীনের আঞ্চলিক নৈতিক কম্যাণ্ড | মুজাহিদীনের আঞ্চলিক নৈতিক কম্যাণ্ড | মুজাহিদীনের আঞ্চলিক নৈতিক কম্যাণ্ড

↑

মুজাহিদীনের সিটি নৈতিক কম্যাণ্ড | মুজাহিদীনের সিটি নৈতিক কম্যাণ্ড | মুজাহিদীনের সিটি নৈতিক কম্যাণ্ড

↑

শাখা নৈতিক কম্যাণ্ড | শাখা নৈতিক কম্যাণ্ড | শাখা নৈতিক কম্যাণ্ড

পরিশিষ্ট 'গ'-এর মন্তব্যসমূহ :

১. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান (শেইখ)-কে প্রেসিডেন্ট এবং প্রত্যেক আরব ও মুসলিম দেশসমূহ থেকে একজন করে কর্মঠ বিদ্বানকে নিয়ে মুজাহিদীনের জন্য সর্বোচ্চ নৈতিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে। এই কম্যাণ্ড মুজাহিদীনের জন্য নিয়মিত বক্তৃতামালা রচনা করবে এবং প্রত্যেক বক্তৃতার সার সংক্ষেপ সংরক্ষণ করবে।

২. অঞ্চলের গ্র্যাণ্ড মুফতী অথবা সেরা বুদ্ধিজীবীকে প্রেসিডেন্ট করে আঞ্চলিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে।

৩. নগরীর বিদ্বানদের নিয়ে নগরীর নৈতিক কম্যাণ্ড গঠিত হবে।

৪. শাখা নৈতিক কমিটিগুলো গ্রামের বিদ্বানদের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। যদি গ্রামে সে ধরনের বিদ্বান না পাওয়া যায়, তাহ'লে শহর থেকে একজন বিদ্বানকে প্রতিনিধি হিসাবে নিতে হবে।

৫. বিদ্বানগণ নিজেদেরকে এবং নিজেদের সহায়-সম্পদকে জিহাদের সেবায় ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=)। **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৩৮.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৩৯.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪০.** মানবিক মূল্যবোধ (২৫/=)। **৪১.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪২.** আরবী ক্বায়েদা (২য় ভাগ) (৪০/=)। **৪৩.** তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, (ইংরেজী) অনু: -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৪টি।